দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সাংবিধানিকতা
—পৃঃ ১৭

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভুলের প্রায়শ্চিত্য
—পৃঃ ২৭

৭২ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা ।। ১৩ জানুয়ারি, ২০২০ ।। ২৭ পৌষ - ১৪২৬ ।। যুগাব্দ ৫১২১ ।। website : www.eswastika.com

BELLA VISTA
51 Limited Edition Flats
Flat Starts From ₹87 Lac Onwards
Birds Eye View
Roof Top Garden
Swimming Pool
Podium
WBHIRA Registration Number : HIRA/P/KOL/2019/000483
www.edengroup.in
Developed by: EDEN
JALAN
9830 116 116

www.edengroup.in
HIRA/P/KOL/2018/000058
https://hira.wb.gov.in/
15.37 L
Onwards
1/2/3 BHK
WITHIN
KMC
AREA
EDEN
TOLLY
CASCADES
ONLY 1% & 5% GST
Cascades of Happiness !
NEAR HARIDEVPUR
OFF KABARDANGA MORE
AC Banquet Hall I Gymnasium I Rooftop Swimming Pool I Rooftop Garden I Indoor Games Room
Meeting Lounge 'The Den' I Children's Play Area (Indoor) I Children's Open Play Area
EDEN
17/1 Landsdowne Terrace
Kolkata - 700026 (Behind Deshapriya Park)
• 9830305003

16
LAKHS
ONWARDS
A perfect blend of
Luxury & Nature
2 BLOCKS | 5 TOWERS | 110 HOMES
EDEN
TOLLY
GARDENIA
The Earth laughs in flowers...
Amenities at Podium Level
Children's Play Room | Swimming Pool | AC Banquet Hall
Gymnasium | Indoor Games Room | Guest Room
1BHK | 2BHK | 3BHK
HIRA/P/KOL/2018/000162 | https://hira.wb.gov.in/
EDEN
Honest Promises. Honest Performances.
8335844466
www.edengroup.in

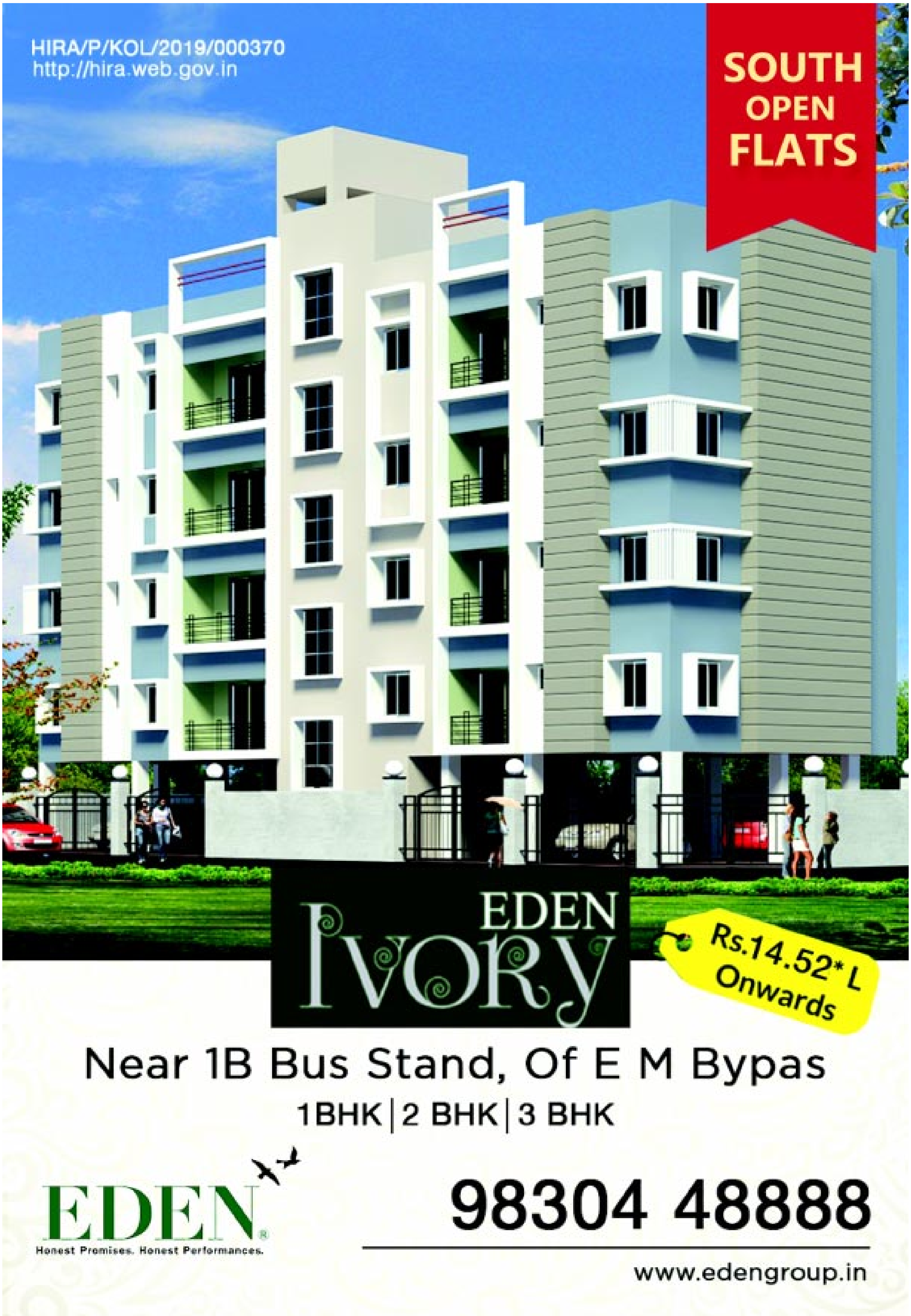
HIRA/P/KOL/2019/000370
http://hira.web.gov.in
SOUTH OPEN FLATS
EDEN Ivory
Rs.14.52* L Onwards
Near 1B Bus Stand, Of E M Bypas
1BHK | 2 BHK | 3 BHK
EDEN
Honest Promises. Honest Performances.
98304 48888
www.edengroup.in

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ২৭ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৩ জানুয়ারি - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

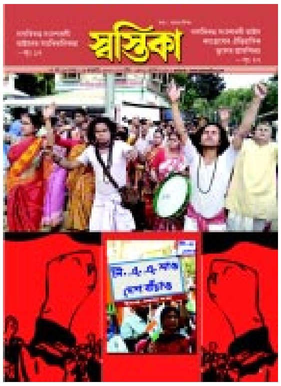

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৯

ভেকধারীদের চিনে নিন, সতর্ক থাকুন   বিশ্বামিত্র ১০

নাগরিক সংশোধনী আইন এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ
 শ্রীরাধা কৃষ্ণত্রয় ১১

এক দশকে ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় বেড়েছে
 চেতন ভগত ১২

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন সম্পর্কে প্রকৃত সত্যতা
 হরদীপ পুরী ১৫

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সাংবিধানিকতা
 বিনয়ভূষণ দাশ ১৭

ঊনিশের প্রাপ্তি মোদী সরকারের সাহসী কূটনীতি
 সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২১

নাগরিকত্ব আইন সীমান্তবর্তী এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুর রক্ষাকবচ গীরেন্দ্রনাথ বর্মণ ২৩

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও উত্তরবঙ্গের জনভাবনা
 ইন্দ্রমোহন রাভা ২৪

মোদীজী পারেন ভোটব্যাঙ্কের কথা না ভেবে কিছু করতে
 পূর্বা চৌধুরী ২৬

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভুলের প্রায়শ্চিত্য শিব প্রকাশ ২৭

পৌষের বিদায়লগ্নে মানুষের ভাবসম্মিলন
 নন্দলাল ভট্টাচার্য ৩১

১৪২৬ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা
 অরিজিৎ রায়চৌধুরী ৩৩

রাজাকার তালিকা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার প্রয়াস
 শিতাংশু গুহ ৩৯

মাস্টারদা সূর্যসেন ও চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন
 প্রণব দত্ত মজুমদার ৪০

দোতারা আর সুরমণ্ডলের যুগলবন্দি— 'তারামণ্ডল'
 তিলক সেনগুপ্ত ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০   চিঠিপত্র : ১৯   সুস্বাস্থ্য: ২০   সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০   রঙ্গম : ৩৫   নবাঙ্কুর : ৩৬-৩৭   চিত্রকথা : ৩৮   সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৪-৪৫   সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৬

প্রকাশিত হবে
২০ জানুয়ারি
২০২০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২০ জানুয়ারি
২০২০

আগামী সংখ্যা সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারতের সংবিধান যেমন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে, ঠিক তেমনি সংবিধানে কিছু মৌলিক কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। সংবিধানবর্ণিত মৌলিক কর্তব্যগুলি প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য পালনীয়। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য দেশের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কিংবা জে এন ইউ এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিক্ষোভে দেশ এবং জাতির প্রতি মৌলিক কর্তব্য পালনের ন্যূনতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। লিখবেন নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, বিমলশঙ্কর নন্দ প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank - Kolkata

Branch : **Shakespeare Sarani**

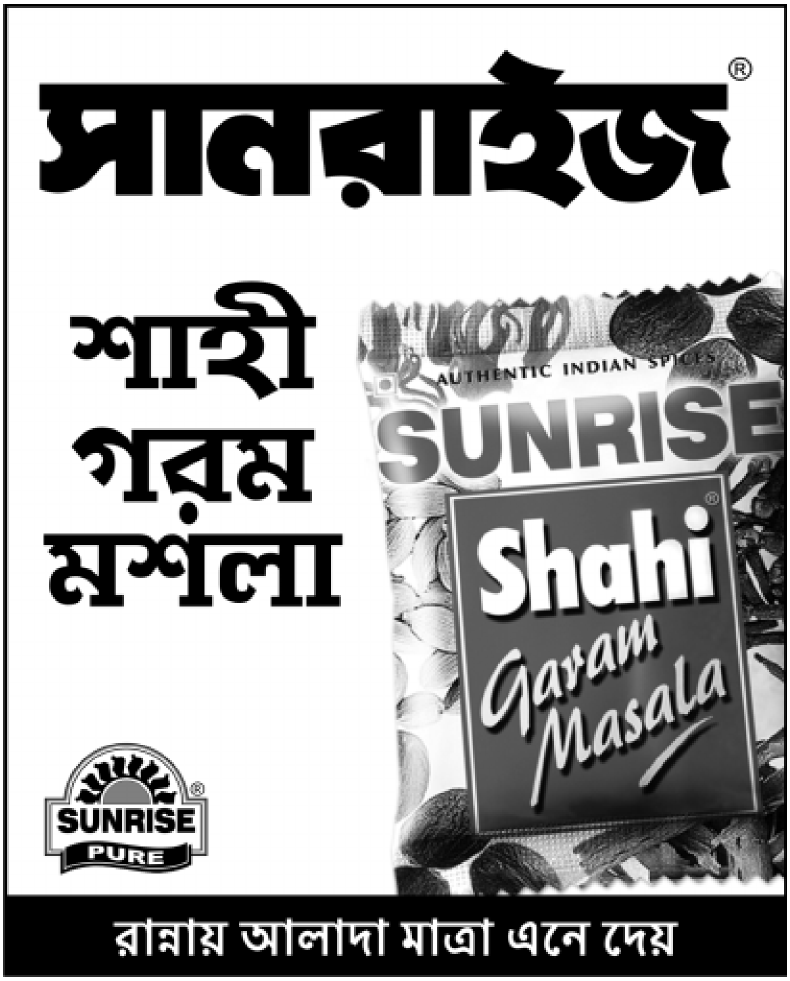

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সত্য প্রকাশিত হউক

সম্প্রতি দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল দুষ্কৃতী কালো কাপড়ে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া তাণ্ডব চালাইয়াছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর তাহারা হামলা চালাইয়াছে। এই তাণ্ডবের নিন্দা করিয়াছেন সকলেই। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়াছেন এই ঘটনার তদন্ত করিয়া দোষীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও দিল্লি পুলিশকে নির্দেশ দিয়াছেন অবিলম্বে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, এই জঘন্য হামলা সংঘটিত করিল কাহারা? হামলাকারীদের চিহ্নিত করিবার আগে বা কোনোরূপ তদন্ত হইবার আগেই বামপন্থী এবং কংগ্রেসিরা হইহই করিয়া বাজারে নামিয়া পড়িয়াছে। তাহারা বলিতেছে, সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এই হামলা সংঘটিত করিয়াছে। মনে হইতেছে, বামপন্থী এবং কংগ্রেসিরা যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই বসিয়াছিল। হামলা হইবার পরমুহূর্তেই তাহারা কাঁসর-ঘণ্টা লইয়া সঙ্ঘ মতাদর্শী সংগঠনের বিরুদ্ধে বাজারে নামিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সত্যই কী বিদ্যার্থী পরিষদ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হাঙ্গামা সংঘটিত করিয়াছে? বামপন্থী এবং কংগ্রেসিরা যাই বলুক না কেন, তথ্য-প্রমাণ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতেছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, গত কয়েকদিন ধরিয়াই নূতন শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম নথিভুক্তকরণে বাধা দিতেছিল একদল ছাত্র-ছাত্রী। ইহাদের বাধা উপেক্ষা করিয়া গরিষ্ঠ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নাম নথিভুক্ত করিতেছিল। গত ৫ জানুয়ারি এই বাধাদানকারী ছাত্র-ছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হামলা চালায়। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল নাম নথিভুক্তকরণের কাজটি পণ্ড করিয়া দেওয়া। রেজিস্ট্রারের এই বিবৃতির সূত্র ধরিয়াই এই কথা উল্লেখ করা যায়, প্রথমাবধিই নাম নথিভুক্তকরণে বাধা সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে ওই ছাত্র-ছাত্রীরা এবিভিপি-কে নয়, আসামীর কাঠগড়ায় তুলিয়াছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনকেই। টিভি ক্যামেরার সামনে এই আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বলিয়াছে, এই হামলাকারীরা নাম নথিভুক্তকরণের কাজে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকদেরও ইহাদের আক্রমণের মুখে পড়িতে হইয়াছিল। এমনকী, কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রী জানাইয়াছে, হামলাকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে তাহারা চিনিতেও পারিয়াছে। যাহাদের তাহারা চিনিতে পারিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র নেতারাও রহিয়াছে। একটি সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের এক সাংবাদিকের সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া একটি ফুটেজে দেখা যাইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র সংসদের নেত্রী ঐশী ঘোষ ওই হামলাবাজদের নেতৃত্ব দিতেছেন।

ইহা ব্যতীত, ওই ঘটনার পরদিন হইতেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্যে জানাইয়াছেন, এই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবেই বামপন্থী ছাত্র সংগঠন দায়ী। তাহারাই পরিকল্পনামাফিক এই হামলা চালাইয়াছে। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ইহাও বলিতেছে যে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বামপন্থী ছাত্র সংসদের বিক্ষোভে তেমন সাড়া মিলে নাই। সেই কারণেই পরিকল্পনা করিয়া এই হামলা সংঘটিত করা হইয়াছে, যাহাতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সহানুভূতি বামদের প্রতি আদায় করা যায়। কিন্তু এককথায় বলা যায়, এই পরিকল্পনা কার্যত ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ ঘটনা ঘটিবার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে সত্যকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—তাহাতে বামপন্থীদের এখন লজ্জায় মাথা নত করা ছাড়া উপায় নাই।

কাজেই, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হামলার ঘটনার নিন্দা করার পাশাপাশি, পূর্ণাঙ্গ তদন্তও দাবি করিতে হইবে। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হইলেই ঝুলি হইতে প্রকৃত বিড়ালটি বাহির হইয়া পড়িবে এবং বামপন্থীদের মিথ্যাচারের রাজনীতিরও পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

সুভাষিতম্

পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদ্ দৈবমিতি কথ্যতে।

তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্যাদতন্দ্রিয়ঃ।।

পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলকে বর্তমান জীবনে দৈব বলা হয়। সেজন্য প্রত্যেক মানুষকে এই জীবনে নিরন্তর ভালো কাজ করে যেতে হবে।

ভেকধারীদের চিনে নিন, সতর্ক থাকুন

প্রথমেই একটা বিষয়ে খোলাখুলি নিন্দা করা যাক। জে এন ইউ-তে সম্প্রতি যে হামলা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা, কোনোমতেই সমর্থন যোগ্য নয়। ঘটনার অব্যবহিত পরেই জেএনইউ-এর প্রাক্তনী তথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়ঙ্কর এর নিন্দা করে বিবৃতি দেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশে তড়িঘড়ি একটি তদন্ত কমিটিও গঠন হয়। ফলত জেএনইউ কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক। তবে সংবাদমাধ্যমের একটি বড়ো অংশ এই হামলার ঘটনাটিকে যথাসম্ভব বিকৃত করছে। একতরফা ভাবে শুধুমাত্র এস এফ আই-এর ওপর হামলা হয়নি, জাতীয়তাবাদী ছাত্র-সংগঠন এবিভিপি-র অন্তত পনেরো জন কার্যকর্তা গুরুতর জখম হয়ে চিকিৎসাধীন বলে সূত্রের খবর।

যে ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেখা যায় জেএনইউ ছাত্র-সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষের সঙ্গে মুখে কালো কাপড় বাঁধা কয়েকজন দুষ্কৃতী ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অভিযোগ গত ৫ জানুয়ারি সকালে এরাই সর্বপ্রথম এবিভিপি সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। আরেকটি সূত্রের মতে, যেহেতু ওইদিন ছিল পরীক্ষার সেমিস্টারের রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিন, উপস্থিত পরীক্ষার্থীদের বিঘ্ন ঘটাতে নকশালি ছাত্রদের একটা বড়ো অংশ সক্রিয় ছিল। তারাই অন্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের ওপর রাতে চড়াও হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারও এই হামলার পেছনে বামপন্থীদের গোষ্ঠীকোন্দলকেই দায়ী করেছেন।

যাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুন্ডাগিরি করে থাকুন না কেন, বিষয়টির কড়া নিন্দা ও পদক্ষেপ হওয়া প্রয়োজন। তবে বাস্তব খুব নিষ্ঠুর। এই পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলি কথা বলতেই হয়। সমস্ত বিরোধী দল এবং ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার হতে শুরু হলো 'গেরুয়াবাহিনী'-র তাণ্ডবে জেএনইউ রক্তাক্ত ইত্যাদি। সংবাদমাধ্যমের একটা বড়ো অংশ এই সুরেই পরেরদিন খবর করলো, টিভি চ্যানেলগুলোও শুধুমাত্র বিরোধীদের বক্তব্যগুলিই 'হাইলাইট' করতে শুরু করলো। সত্য-মিথ্যা জানার প্রয়োজন ছিল না, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি মতাদর্শ কিংবা কায়েমি স্বার্থ এই ধরনের প্রচারে অক্সিজেন জুগিয়েছে। এবং এর ফলে দেশজুড়ে শুরু

বিশ্বামিত্র-র কলম

হয়েছে বিপজ্জনক এক প্রবণতা।

এই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়েও প্রকাশ্যে সামাজিক বয়কটের ডাক দেওয়া যেতে পারে, কাকে? না যে দল মাত্র কয়েকমাস আগে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতের ক্ষমতায় এসেছে, সেই দলকে। তাদের কর্মী-সমর্থকদের প্রকাশ্যে দেখলেই মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বিচারে। এই অভাবনীয় ঘটনার প্রত্যক্ষ নজির জেএনইউ-এর হামলার ঘটনা। এই প্রেক্ষিতে বিশ্বামিত্রের একটি বিনম্র নিবেদন রয়েছে, হামলার কড়া নিন্দা করেও— জেএনইউয়ে হামলা কাণ্ডের অব্যবহিত আগেই যাদবপুরের একটি ঘটনা সামনে

> **দোর্দণ্ড প্রতাপ বামআমলেই স্লোগান উঠেছিল 'ছাত্রদের ছাত্রপ্রেম, এরই নাম সিপিএম।' আজ অবলুপ্তির যুগেও একই-পন্থা? প্রশ্নগুলি সহজ, উত্তরও তো জানা।**

এসেছে। শ্লীলতাহানি, মেয়েদের অসম্মান, সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রহীনতা ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগে এসএফআই-এর ৩২ জন তাবড় নেতা-নেত্রীর পদত্যাগ। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন মানেই পড়াশুনোয় তুখোড়, সামাজিক ন্যায়ে অনবদ্য ভূমিকা পালনকারী, সর্বোপরি বিপ্লবী। তাদের অতি সুবোধ বালক প্রমাণের যে অপচেষ্টা হচ্ছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সর্বজনসমক্ষে এদের প্রকৃত চেহারাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। নাগরিকত্ব আইন, এনপিআর-বিরোধিতা ক্রমে বুমেরাং হচ্ছে এটাও বোঝা যাচ্ছিল। বুঝবেন কী করে?

মুসলমান জাতিসত্তাকে এতদিন যারা সর্বাগ্রাধিকার দিয়েছিল, সেই জামিয়া মিলিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় পতাকা হাতে জাতীয় সংগীত গাইছে, এমন ভিডিয়ো ভাইরাল হলো। 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' ছিল যাদের এতকালের স্লোগান, তারাই এখন দেশপ্রেমী হলো কোনো মন্ত্রবলে?

এই ভেকের প্রয়োজনীয়তাটা বুঝতে হবে। সাধারণ মানুষ যে আর বামপন্থীদের বিশ্বাস করে না, বিগত নির্বাচনগুলো তার প্রমাণ দিয়েছে। শুধু জেএনইউ, যাদবপুরের মতো হাতে গোনা কিছু প্রতিষ্ঠান তাও কেবল কলা-বিভাগে এদের অস্তিত্ব রয়েছে, অন্যান্যদের 'অশিক্ষিত' বলার মধ্যে যে আত্মগরিমা ছিল, তা এদের আরও একঘরে করে দিয়েছে। ফলে সাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সহানুভূতিটুকুই ভরসা। জেএনইউ তারই আভাস দিল। সঙ্গে বামপন্থীদের যেটা চিরকালীন বৈশিষ্ট্য, মানুষে মানুষে ঘৃণা, বিদ্বেষ তৈরি করে পরিস্থিতির ফয়দা লোটা—এবারও সোশ্যাল মিডিয়ায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দোর্দণ্ড প্রতাপ বামআমলেই স্লোগান উঠেছিল 'ছাত্রদের ছাত্রপ্রেম, এরই নাম সিপিএম।' আজ অবলুপ্তির যুগেও একই-পন্থা? প্রশ্নগুলি সহজ, উত্তরও তো জানা। ■

নাগরিক সংশোধনী আইন এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ

শ্রীরাধা কৃষ্ণত্রয়

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ যে হিংস্রতায় পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন অংশে সপ্তাহ খানেক ধরে রাস্তায় বাসের পর বাস, মোটর সাইকেল এবং ট্রেন জ্বালিয়ে, স্টেশন ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করে, তার সঙ্গে রেলের টাকা লুট করে বাধাহীন ভাবে তাণ্ডব চালাল তা দেখে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। ভয় হয় আবার দেশান্তরি হয়ে উদ্বাস্তু হতে হবে না তো! কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে আমি যে একজন উদ্বাস্তু। এ কোন বাঙ্গলা আমরা দেখছি। আরও শিউরে উঠেছি দাঙ্গাকারীদের বয়স দেখে। এদের মধ্যে যুবক থেকে শুরু করে বেশ কিছু মধ্যবয়স্ক এবং প্রৌঢ়কে যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি সাত আট বছরের শিশুদের। ভাবলে অবাক হতে হয়, সাত আট বছরের শিশুরাও আজ পশ্চিবঙ্গের নির্দ্বিধায় দাঙ্গায় মেতে উঠেছে।

নাগরিক সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে জেহাদি মসলমানদের তাণ্ডব ও সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গলার বিদ্বজ্জন ও সুশীল সমাজের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই। বিদ্বজ্জনেরা বেশ কিছুদিন ধরেই নাগরিক আইনের বিরুদ্ধে যে উচ্চতায় বিরোধিতা করে চলেছেন তার বিন্দুমাত্র বিরোধিতা ও প্রতিবাদ আপনারা এই জেহাদি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে করলেন না কেন? কিসের এতো ভয় আপনাদের? তবে কি আপনারা আন্দোলনের নামে এই তাণ্ডব ও বর্বরতাকে সমর্থন করেন? এটাকে কী আপনারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে মনে করেন? যে ভাবে কলকাতার পথে স্কুল ফেরত শিশুরা ভয়ার্ত মুখে স্কুল বাসের মধ্য আটকে ছিল। তাদের ভয়ার্ত মুখগুলো কী আপনাদের চোখে পড়েনি? ওইসব শিশুদের বাবা-মায়ের মনের অবস্থা কী আপনারা অনুভব করতে পারেন না? পারেন, নিশ্চয়ই পারেন। আসলে রাজনৈতিক তাঁবেদারির দায়বদ্ধতায় আপনাদের অনুভবগুলির মৃত্যু হয়েছে। আপনারা জড় পদার্থের আকার নিয়েছেন। রোজ নিয়ম করে টেলিভিশনের পর্দায় শান্তির আবেদন না করে তাণ্ডবকারীদের এলাকায় তাণ্ডবকারীদের মধ্যে গিয়ে কেন শান্তির আবেদন করলেন না। শুধু কলকাতায় পদযাত্রা না করে কেন যাচ্ছেন না তাণ্ডব বিধ্বস্ত এলাকায়। জানি ওই সব অঞ্চলে যেতে আপনাদের ভয় হয়। কারণ আট থেকে আশির ওইসব দাঙ্গাকারীদের আপনারা জানেন, চেনেন, তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনারা ভালোই অবগত, আর সেই কারণেই কালিয়াচক থেকে ধুলাগড়, বসিরহাট থেকে ক্যানিংয়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হলে আপনারা শুধু স্থবির হয়ে থেকেছেন। ঘরের মধ্যে থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। স্বার্থের ভয়ে অসাম্প্রদায়িক তকমা রক্ষায় ক্রমাগত মুসলমান তোষণ করে সত্যি বলার অভ্যাসটাই আজ আপনারা হারিয়ে ফেলেছেন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের ভারতবর্ষে আশ্রয় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমার প্রশ্ন, ভারতে আশ্রয় না পেলে তারা কোথায় আশ্রয় পাবে? অবিভক্ত ভারতের তাঁরাও তো বাসিন্দা। দেশ ভাগে ওই মানুষগুলির তো কোনো ভূমিকা ছিল না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ না হলে তাদের জীবনের কি এই করুণ পরিণতি হতো? স্বাধীনতার বলি অত্যাচারিত মানুষদের প্রতি আমাদের কী কোনো দায়বদ্ধতা নেই? আমাদের ক্ষমতাললুপ নেতারা সেদিন ধর্মান্ধ মুসলমানদের অন্যায় ও আগ্রাসী দাবির কাছে মাথা বিকিয়ে দেশভাগ মেনে নিয়ে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষকে বিপন্ন করে যে পাপ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাদেরকেই করতে হবে। এবং তা করতে হবে ওই তিন দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় দিয়ে, আপন করে কাছে টেনে নিয়ে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে সংখ্যালঘুরা যে চরম অত্যাচারের শিকার তা কী বুদ্ধিজীবীরা অস্বীকার করতে পারেন? ওই সব দেশের সংখ্যালঘু অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনোদিন একটি বারের জন্য পথে নেমেছেন? একটিও শব্দ উচ্চারণ করেছেন? করেননি। ওসব অন্য দেশের ব্যাপার বলে দায় এড়িয়ে গেছেন। বাংলাদেশের প্রিয়া সাহার আর্তনাদ আপনাদের কানে কী পৌঁছয় না? বাংলাদেশ, পাকিস্তানে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান-সহ অন্য সংখ্যালঘু মহিলাদের যে ভাবে অপহরণ ও ধর্মান্তরিত করে বলপূর্বক যে মুসলমান যুবকেরা বিয়ে করে চলেছে সেই সংবাদ তো সংবাদমাধ্যমে মাঝে মাঝেই শিরোনাম হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিজীবীদের অনেকেরই পশ্চিমবঙ্গের পূর্বপুরুষেরা স্বাধীনতার সময় এবং তার পরে পূর্বপাকিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এদেশে পালিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং মুসলমানদের প্রধান দেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা ও পরিণতি আপনারা অনেকের থেকে ভালো জানেন। প্যালেস্টানীয়দের জন্য, রোহিঙ্গা মুসলানদের জন্য আপনাদের অন্তর কাঁদবে। কিন্তু পাশের দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপনারা বোবার মতো নীরব থেকেছেন। এ দ্বিচারিতা কেন? কেন রাজনৈকি দলের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়ে নাগরিক সংশোধনী আইনের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টিতে সাহায্য করছেন? মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকুন। দয়া করে শরণার্থীদের অবস্থা একটু মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখুন।

বিদ্বজ্জন যারা বলছেন, এই বিলে কেন মুসলমানদের স্থান দেওয়া হয়নি। তাদের বলতে চাই, যারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করেছে শুধুমাত্র হিন্দুদের থেকে আলাদা থাকার জন্য। তাদের তো আর নতুন করে এ দেশে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্ন নেই। তারা তো ওই দেশগুলিতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। তারা হলো অত্যাচারী। ওইসব দেশের অত্যাচারী সংখ্যাগুরু মুসলমানদের স্থান ভারতে হতে পারে না। যারা সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অস্তিত্বকে মানতে চায় না, স্বীকার করে না। ভারতবর্ষ কখনও সেই অত্যাচারীদের আশ্রয় নিতে পারে না, ভারতবর্ষ আশ্রয় দেবে কেবল অত্যাচারিতকে এবং পীড়িতকে; অত্যাচারীকে নয়।

এক দশকে ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় বেড়েছে

অতিথি কলম

চেতন ভগত

শুরু হওয়া নতুন দশককে সাদর অভ্যর্থনা! একজন ব্যক্তির জীবনে ১০ বছর বেশ দীর্ঘ সময় কিন্তু ভারতের মতো বিশাল দেশের কাছে তা এমন কিছু নয়। স্মরণে আসবে অতীতের ২০২০ ভিশান ডকুমেন্টের কথা। সে সময় অনেকে আশা করেছিলেন এই ২০২০-তে ভারত 'সুপার পাওয়ার' দেশগুলির তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। যাইহোক, সেই আশা পূর্ণ না হলেও, গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অনেক কিছুই হয়েছে।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অন্যতম ইঙ্গিতবাহী সূচক জিডিপি অনুযায়ী দশ বছরে মাথাপিছু আয় বছরে ১ হাজার ডলার থেকে ২ হাজারে পৌঁছে দ্বিগুণ হয়েছে। বাৎসরিক বৃদ্ধির গড় হিসেবে এই হার ৭.২ শতাংশ। নিশ্চিতভাবে সাধারণ ভারতবাসীর হাতে আসা এই টাকা তার নিজস্ব সম্পদ। অবশ্যই ১০ বছর আগে আমরা যে পরিমাণ খরচ করতাম এখন তার দ্বিগুণ করতে পারি। এই উন্নতির পেছনে কোনো গোপন রাজনৈতিক মতামত বা গৌরব সন্ধান উদ্দেশ্য নয়। বিগত দশকটিতে শাসন পরিচালনায় কংগ্রেসও ছিল বিজেপিও ছিল। তাই এটি যুগ্ম সাফল্য। হ্যাঁ, আমরা হয়তো আরও দ্রুত এগোতে পারতাম।

অবশ্যই একটি উন্নত দেশের তকমা পেতে গেলে আমাদের আরও অনেক পথ হাঁটতে হবে— যেমন আমেরিকা (মাথা পিছু ৬০ হাজার ডলার) এমনকী চীন (১০ হাজার ডলার মাথা পিছু)। কিন্তু আমরা তো ২০৩০-এর মধ্যে মাথা পিছু আয় অন্তত্পক্ষে ৫ হাজার ডলারে নিয়ে যাওয়ার আশা করতেই পারি। এটি একটি সম্মানজনক স্তর, নিঃসন্দেহে। কেননা এখানে পৌঁছতে পারলে আমরা গরিব দেশের তকমা ঝেড়ে ফেলতে পারব। আবার ২০৪০-এর মধ্যে গড় আয়কে ১২ হাজার ডলার ছোঁয়াতে পারলে আমরা সেমি ডেভেলপমেন্ট দেশের মান ছুঁতে পারব। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে থাকবে যারা জীবদ্দশায় এটা চাক্ষুষ করবে। সুপার পাওয়ার হওয়ার অত্যন্ত গালভরা আহ্বান ছেড়ে আগামী দু'দশক অর্থাৎ ২০৩০-এর মধ্যে মাথাপিছু ৫ হাজার, ২০৪০-এ ১২ হাজার ডলার আয় যদি জিডিপি-র অংশ হতে পারে সেটিই হবে বলার মতো সাফল্য।

"৫ ট্রিলিয়ন ডলার পূরণ করার লক্ষ্য ন্যায়সঙ্গত হলেও এই ব্যক্তি-আয়ের বৃদ্ধির প্রোজেকশানটি বেশি আকর্ষক। আজকের ডলার মূল্যে তা জন প্রতি ৩০ হাজার ও পরিবার প্রতি প্রায় ১ লক্ষের কাছাকাছি। এই টাকায় ভারতীয় নাগরিকরা একটি ভদ্রস্থ, মর্যাদাব্যঞ্জক ও ভব্য জীবনযাত্রার অধিকারী নিশ্চয় হতে পারে। আর এই আয়সীমায় পৌঁছনো নিশ্চিত সম্ভব। তাই আমাদের 'সুপার পাওয়ার'-এর কঠিন স্বপ্ন থেকে সাময়িক সরে এসে প্রত্যেকের পক্ষে হিতকর, অর্জনক্ষম এই লক্ষ্যটিকে সর্বতোভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যে সরকারকে সক্রিয় রাখার সবরকম প্রয়াস নিতে হবে।"

হয়তো, এই হিসেবটা 'সুপার পাওয়ার' শব্দদুটির মতো অত ঝংকারময় নয় তবে এই লক্ষ্য পূর্ণ করা ভারতবাসীর জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন এনে দেওয়ার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। মাথাপিছু জিডিপি-তে বৃদ্ধি ২০১০-এর তুলনায় দ্বিগুণ হওয়ার কথা বাদ দিলেও আজ দেশে ভালো রাস্তা, ভালো বিমানবন্দর আর প্রায় প্রত্যেকের কাছে একটা মোবাইল ফোন থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। অধিকাংশ মানুষ মোবাইল যোগাযোগে আজ অভ্যস্ত। নির্মম দারিদ্র্য অনেক কমে এসেছে। শিক্ষা, স্বাস্থের নির্ণায়ক সূচকগুলি বাড়ছে।

এক নজরে দেখলে গত দশকের অগ্রগতিকে ভালোই বলা যায়। কিন্তু ২০২০-র এই নতুন দশকে আমরা কিন্তু খানিকটা ঝিমধরা অর্থনীতির হাত ধরেই প্রবেশ করছি। আগেই বলেছি গত দশকে বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৭.২ শতাংশ। কিন্তু সর্বশেষ ত্রৈমাসিক বৃদ্ধির পরিসংখ্যান অনুযায়ী তা ৪.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে মাথাপিছু ৫ হাজার ডলার রোজগারে পৌঁছতে গেলে বাৎসরিক গড় জিডিপি বৃদ্ধিকে ৯.৬ শতাংশে পৌঁছতে হবে। এটি অর্জন করা সম্ভব কিন্তু তা বাস্তব করতে গেলে অন্য সবকিছু সরিয়ে রেখে এই লক্ষ্যকেই পাখির চোখ করতে হবে।

আগামী ১০ বছরে জাতির যৌথ লক্ষ্য হবে জনপ্রতি আজকের আয়ের চেয়ে ঠিক আড়াইগুণ বাড়ানো (এখনকার ২০০০-কে করতে হবে ৫০০০ হাজার ডলার)।

এই লক্ষ্য পূরণে কয়েকটা বিষয়কে একত্রিত করে এগোতে হবে : (১) বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, (২) শিল্পোদ্যোগ সহায়ক নীতি প্রণয়ন, (৩) পদে পদে নিয়ন্ত্রণ বা আমলাদের মাতব্বরি, (৪) আয়কর আধিকারিকদের অকারণ নাক গলানো এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতাদের অনাবশ্যক ক্ষমতা প্রদর্শন একেবারে নিষিদ্ধ করতে হবে। দেশের মধ্যে নিরাপত্তা ও একতার বোধ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হারে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে যতবারই জিএসটি কাউন্সিলের মিটিং হবে প্রত্যেকটিতেই কোনো না কোনো জিনিসের ওপর কর হারে পরিবর্তন বিনিয়োগকারীদের হতচকিত করে দিচ্ছে। গোয়ায় আয়োজিত জিএসটি বৈঠকে এমনটাই ঘটেছিল।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলাই বাতুলতা, কেননা প্রস্তাবিত বিমানবন্দরগুলি এমন হতে হবে যেখানে তিন মাস ছাড়া মেরামতির কাজ করতে হবে না। একই সঙ্গে ইন্টারনেট সংযোগ এমন রাখতে হবে যা খেয়াল খুশিমতো বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। প্রায়শই যাতে সার্ভার ডাউন হয়ে না পড়ে থাকে। বিদ্যুৎ আর অবিচ্ছিন্ন জলের সরবরাহ ছাড়া কারখানার অস্তিত্ব ভাবাই যায় না। তাই এই দুটিও চূড়ান্ত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র।

এই বিষয়কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ পূর্বেও করা হয়েছে। বিভিন্ন আলোচনা সূত্রে শীর্ষেও উঠে এসেছে। সমাধান নেই এমন নয়। কেননা বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। যেটার ঘাটতি রয়েছে তা হলো অগ্রাধিকার ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার সমস্যা। কোনো না কোনো অজ্ঞাত কারণে আমরা ভারতীয় হিসেবে ও আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা দলগুলি সেভাবে কখনই নিজেদের সংকল্পবদ্ধ করেনি যে ভারতীয়দের আয় বাড়ানো একান্ত জরুরি এবং এটিই সর্বাধিক গুরুত্বের মর্যাদা পেতে পারে।

ধর্মকে নিয়ে এগিয়ে চলা চলবে, জাতপাতকে কেন্দ্রবিন্দু করা গ্রহণীয়, নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভাবমূর্তি ঘিরে আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণের ইচ্ছেও স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা ও আমাদের নেতাদের মধ্যে ভারতবাসীকে আয়ের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছল, প্রাচুর্যময় করে তোলার বিষয়ে কখনই অন্তরে তীব্র আবেগ অনুভব করেছি বা নেতারা করেছেন বলে মনে হয় না। ক্ষমতায় থাকা সরকার হয়তো ভেবেছে মানুষ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাহলে আমাদের অত চিন্তা করার কী আছে।

পাকিস্তানের বেয়াদপির বিরুদ্ধে জোর থাপ্পড় কষানোয় বা হিন্দু হিসেবে আমাদের শ্রেষ্ঠতায় গর্ব হওয়া দোষের নয়। তবে প্রত্যেক ভারতীয়ের স্বাচ্ছল্য গৃহ, শিক্ষা ও ব্যাধির ক্ষেত্রে সুচিকিৎসা পাওয়াকে আমরা যদি অগ্রাধিকার না দিই তাহলে চিরগরিব থাকাই হয়তো আমাদের পক্ষে যথাযথ।

অর্থনীতিকে স্বাধীন গতিতে চলতে গেলে সরকারকে নিজের ও তার অমলাতন্ত্রের ক্ষমতাকে কিছুটা ছাঁটতেই হবে। তারা সহজে এটা করতে চাইবে না যদি না আমাদের মতো সাধারণ মানুষরা তাদের এদিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাপ দিই। যদি আমরা নাগরিক হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখি সেক্ষেত্রে সরকারেরও অর্থনীতিকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে সর্বশক্তি প্রয়োগ ছাড়া উপায় থাকবে না। তাই নতুন দশককে স্বাগত জানানোর সঙ্গে আমরা সংকল্প নিই যে ২০৩০-কে আমরা মাথাপিছু ৫ হাজার ডলার আয়ের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করবই। এই ধরনের লক্ষ্য মানুষকে বোঝানোর পক্ষেও সহজ, কেননা এর মধ্যে একটি ব্যক্তি-যোগাযোগের স্পর্শ আছে। ৫ ট্রিলিয়ন ডলার পূরণ করার লক্ষ্য ন্যায়সঙ্গত হলেও এই ব্যক্তি-আয়ের বৃদ্ধির প্রোজেকশানটি বেশি আকর্ষক। আজকের ডলার মূল্যে তা জন প্রতি ৩০ হাজার ও পরিবার প্রতি প্রায় ১ লক্ষের কাছাকাছি। এই টাকায় ভারতীয় নাগরিকরা একটি ভদ্রস্থ, মর্যাদাব্যঞ্জক ও ভব্য জীবনযাত্রার অধিকারী নিশ্চয় হতে পারে। আর এই আয়সীমায় পৌঁছনো নিশ্চিত সম্ভব। তাই আমাদের 'সুপার পাওয়ার'-এর কঠিন স্বপ্ন থেকে সাময়িক সরে এসে প্রত্যেকের পক্ষে হিতকর, অর্জনক্ষম এই লক্ষ্যটিকে সর্বতোভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যে সরকারকে সক্রিয় রাখার সবরকম প্রয়াস নিতে হবে।

(লেখক প্রখ্যাত সাহিত্যিক)

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook E-mail : drsinvestment@gmail.com
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

রম্যরচনা

বাঙ্গালি সমাজে লুঙ্গি

লুঙ্গি একটি দু'দিক খোলা আরামদায়ক পোশাক। বাঙ্গালি সমাজে লুঙ্গির অবদান অসামান্য। এটি গায়ে দেওয়া যায়। পেতে বসার কাজে, এমনকী গামছার বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব। বিদেশে লুঙ্গিকে অন্য আঙ্গিকে তুলে ধরে 'লুঙ্গি ব্রাদার্স' বৃহৎ মুনাফা অর্জন করেছে। লুঙ্গিতে বিনিয়োগ করে বাঙ্গালিও ব্যবসায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালি লুঙ্গি পরিত্যাগ করতে পারে না। গ্রামবাঙ্গলার মানুষ লুঙ্গি পরে সাঁতার কাটেন, গাছে চড়েন, সাইকেল চালান, এমনকী ফুটবলও খেলেন। আর শহরের লোকেরা লুঙ্গির বহুল প্রচারের উদ্দেশে মিছিল বের করেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা থাকে, গিফটে পাওয়া সাধের লুঙ্গি কোমরে জড়িয়ে নে রে ভাই/ট্রাউজারে আর হাফপ্যান্টে এমন মজা নাই রে নাই।

উবাচ

"যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে মারা হলো, রাজ্যপালকে গোব্যাক বলা হলে, তখন মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে কোনো নিন্দা শুনিনি। তখন তাঁর বিবেক জাগেনি। এখন কুমিরের কান্না কেন?"

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি
তথা সাংসদ

সম্প্রতি জেএনইউ ঘটনায় মমতা ব্যানার্জির প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে

"কংগ্রেস, আপ ও কমিউনিস্টদের একটি দলের সঙ্গে আরও কয়েকজন মিলিত হয়ে সারা দেশে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের নিশানায় রয়েছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সেখানে তারা অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।"

প্রকাশ জাভড়েকর
কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ
উন্নয়ন মন্ত্রী

সম্প্রতি জেএনইউ কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে

"মুখ্যমন্ত্রীর তোষণনীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় অনুপ্রবেশকারীরাই সংখ্যাগুরু। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী ক্ষেত্র ডায়মন্ডহারবার বা বসিরহাটে গেলে দেখা যাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, ভারতীয়রা সংখ্যালঘু।"

বাবুল সুপ্রিয়
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

বিজেপির রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে

"সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে যে অশান্তি হচ্ছে তার জন্য দায়ী আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেস। বিশেষ করে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।"

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির বিক্ষোভ প্রসঙ্গে

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন সম্পর্কে প্রকৃত সত্যতা

হরদীপ সিংহ পুরী

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন, ২০১৯ নিয়ে বিরোধী দলগুলি তুমুল সরকার বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। বিরোধী দলগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি ও কুৎসায় লিপ্ত রয়েছে। দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করছে এবং ব্যাপক হিংসায় প্ররোচনা দিচ্ছে। সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বিরোধী দলগুলি পাথর ছোঁড়াছুড়ি, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশকে আক্রমণ করেছে, যা গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মতাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমনকী, কেউ কেউ আবার বিদেশি হস্তক্ষেপেরও দাবি জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামলীলা ময়দানে এই আইন সম্পর্কে বিশদে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এই আইন নিয়ে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দূর করার কথা বলেছেন। দেশে ও বিদেশে রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও যাবতীয় সন্দেহের নিরসন ঘটিয়ে দেশ জুড়ে একাধিক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা হয়েছে, যেখানে সত্যিকার প্রকৃত শক্তির প্রতিফলন ঘটেছে।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন আমাদের বৈচিত্র্যের সত্যতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতীয় সভ্যতার বিষয়গুলিকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, যা প্রায় ৭ হাজার বছরের পুরনো। আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব এক সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। আমাদের সভ্যতাগত ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয় মালাবার জিউস, সিরিয়ান খ্রিস্টান, তৎকালীন পার্সিয়ার পারসি সম্প্রদায় অথবা আমার অভিভাবক, যাঁরা সকলেই দেশ বিভাজনের ফলশ্রুতি-স্বরূপ হিংসার কারণে অন্যত্র চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এই দেশেই তাঁরা সকলেই নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ওই সমস্ত ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত এবং এই আইন ভারতীয় সভ্যতার মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত। এটা সুবিদিত যে, ওই দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের ওপর ধর্মীয় নিপীড়ন হয়েছে। এই আইনে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তান-সহ ওই দেশগুলি থেকে যাঁরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের আশ্বস্ত করার কথা বলা হয়েছে।

শিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমি এমন একটি রাষ্ট্রের মানুষ হিসেবে গর্বিত, যে রাষ্ট্র বিশ্বের সমস্ত ধর্ম ও সমস্ত রাষ্ট্রের ধর্মীয় নিপীড়িত ও শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। মোদী সরকার ভারতে এই পরম্পরায় ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন আইন কার্যকর করেছে। আসলে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন হলো— ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়বাহক, যেখানে ভারতীয় ভূখণ্ডে ইতিমধ্যেই বসবাসকারী প্রত্যেকের নিরাপত্তার কথা রয়েছে।

এই আইনে যে সমস্ত কথা বলা হয়নি, তা উল্লেখ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আইনে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে কোনও ভারতীয় নাগরিকেরই অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়নি। ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এই আইনের দরুন যে ভয়ের কথা বলা হচ্ছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন ও অসত্য। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের মনে ভয় ঢুকিয়ে, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়কে প্ররোচিত করে ঘৃণ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা হচ্ছে এবং এ ধরনের ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্কিত পন্থা অবলম্বনের বিষয়গুলিকে মনে করিয়ে দেয়।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ভারতের তিনটি প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের কাছে কোনও খোলা আমন্ত্রণ নয়। বিরোধীদের কেউ কেউ একে খোলা আমন্ত্রণ হিসেবেই দেখছেন। ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বর চূড়ান্ত দিন স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই আইনে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব দানের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা শরণার্থী হিসেবে ইতিমধ্যেই ভারতে রয়েছেন এবং যাঁদের বর্তমানে ভোটাধিকার রয়েছে। এই নাকরিকত্ব দানের সঙ্গে নতুন দিল্লির অনুমোদনহীন কলোনিগুলির বাসিন্দাদের সম্পত্তির অধিকার দানের তুলনা চলে।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের মাধ্যমে কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়ার বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, বিষয়টি কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘু, যাঁরা ওই তিন দেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যুক্ত নয়, তারও অতিরিক্ত কিছু। আইন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিদ্যার ব্যাপারে সম্যক ধারণা থাকলে এ ধরনের সন্দেহগুলি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। প্রথমত, এই তিনটি ইসলামিক দেশ। সুতরাং, ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলিতে ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের নিপীড়নের

কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তবে, এর অর্থ এটা নয় যে, ওই তিন দেশে যে সমস্ত মুসলমান ধর্মীয় কারণ ছাড়া অন্যভাবে নিপীড়িত হয়েছে, তাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন না। প্রকৃত ঘটনা হলো— বিগত পাঁচ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ওই তিন দেশের প্রায় ৬০০ জন মুসলমানকে নাগরিকত্ব দিয়েছেন। সুতরাং সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন মুসলমান বিরোধী বা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকেই অবজ্ঞা করে--- বিরোধীদের এই মিথ্যা অপবাদ ধোপে টেকে না।

দ্বিতীয়ত, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে কার্যকর করা থেকে বিরত রাখার জন্য ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রয়োগের কথাও বলা হয়েছে। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ মনোযোগ দিয়ে পড়লে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, বিগত সাত দশক ধরে অনুচ্ছেদে যে সমস্ত নজির রয়েছে, সেগুলি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের মতো একটি বিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে বলতে হয়, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন তাঁদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে, যাঁরা ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যের শিকার।

তৃতীয়, প্রতিটি আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ স্থির করার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। এমনকী, অধিকাংশ উন্নত দেশই শর্তা ছাড়া বা বিচারবিশ্লেষণ না করে নাগরিকত্ব প্রদান করে না। আধুনিক ভারতের ক্ষেত্রে তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, উগান্ডা অথবা বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের সকলকেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাই, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কোনোভাবেই মানবাধিকারের অঙ্গীকারকে লঙ্ঘন করে না, বরং এই আইন মানবিকতার মূল্যবোধগুলিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

সবশেষে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সঙ্গে জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর বিবাদ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদী গত ২২ ডিসেম্বর তাঁর ভাষণে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সরকারি স্তরে এনআরসি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এনআরসি প্রক্রিয়া কেবল অসমেই সীমাবদ্ধ। এনআরসি এবং সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের মধ্যে রহস্যজনক যোগসূত্র খুঁজে বের করা, বিশেষ করে যখন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের ক্ষেত্রে ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বরকে চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে, তখন ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির স্বার্থে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং তথাকথিত কয়েকটি ধর্মনিরপেক্ষ তকমাধারী দল কয়েক দশক ধরে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ভোটব্যাঙ্কের এই রাজনীতি ২০১৪-তে মানুষ প্রথমবার প্রত্যাখ্যান করেন।

শিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমি এমন একটি রাষ্ট্রের মানুষ হিসেবে গর্বিত, যে রাষ্ট্র বিশ্বের সমস্ত ধর্ম ও সমস্ত রাষ্ট্রের ধর্মীয় নিপীড়িত ও শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। মোদী সরকার ভারতে এই পরম্পরায় ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন আইন কার্যকর করেছে। আসলে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন হলো--- ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়বাহক, যেখানে ভারতীয় ভূখণ্ডে ইতিমধ্যেই বসবাসকারী প্রত্যেকের নিরাপত্তার কথা রয়েছে। যাঁরা বিভ্রান্তির দরুন অন্ধ, তাঁরা ভারতের সমাজ ব্যবস্থার ক্ষতি চাইছেন। তাই, দায়িত্ববান ভারতীয় হিসেবে এটা আমাদের কর্তব্য যে, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এ ধরনের শক্তিগুলিকে উপেক্ষা করা এবং আমাদের সভ্যতাগত ঐতিহ্যের মূল্যবোধগুলিকে তুলে ধরা।

(লেখক কেন্দ্রীয় আবাসন ও শহরাঞ্চল বিষয়ক স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহণ বিষয়ক স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে
মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

আবেদন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বর্গত প্রচারক বসন্তরাও ভট্টের কর্মজীবন সংবলিত একটি গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বসন্তদার সান্নিধ্যে যাঁরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা তাঁর জীবনের বহু প্রেরণাদায়ী মুহূর্তের সাক্ষী রয়েছেন। সেই সব ঘটনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে তা বর্তমান প্রজন্মের কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের প্রেরণাস্বরূপ হবে। সেজন্য এরকম কার্যকর্তা বা স্বয়ংসেবকদের লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। লেখার সঙ্গে নিজের পরিচয়, ঠিকানা ও ফোন নং দিতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ২০২০।

—ভবদীয়—

অদ্বৈতচরণ দত্ত
অঃ ভাঃ সহ প্রচারক প্রমুখ
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বিশ্বনাথ বিশ্বাস
সভাপতি
পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

লেখা পাঠাতে হবে

সুদীপ তেওয়ারী
কার্যালয় প্রমুখ কেশব ভবন
৮২৪০৯২১৫৪৪

বাসুদেব পাল
কল্যাণ ভবন
৯৬৭৪৫১৪৯৫২

গজানন বাপট
পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম
৯৪৩৩৯৮৮৯৪৫

basudebp421@gmail.com

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সাংবিধানিকতা

বিনয়ভূষণ দাশ

এই লেখা যখন লিখছি তখন লোকসভা এবং সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' পাশ হয়ে গেছে। কিন্তু বিরোধী দল এবং তার নেতৃবৃন্দ এই বিলকে সংবিধান বিরোধী বলে দেগে দিচ্ছেন। বিশেষত এই বিল সংবিধানের ৫, ১০,১৪, ১৫, ২৫ এবং ২৬ ধারা বিরোধী বলে মন্তব্য করে বিলটিকে সংবিধানবিরোধী বলে অভিহিত করেছেন। তিনজন বিশিষ্ট আইনজীবী ও প্রাক্তন বিচারপতির মন্তব্য এই প্রসঙ্গে সমীচীন। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মদন বি লোকুর বলেছেন, 'বিলটি সংবিধানের ১৪তম অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করছে। যুক্তিসঙ্গত ভেদাভেদ বৈধ নয়।' ভারতের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল সোলি সোরাবজি বলেছেন, ''এই বিল সংবিধানের পরীক্ষায় পাশ করবে না। সমানাধিকারই সংবিধানের ভিত। বিলটি সমানাধিকারের বিরোধী।'' আর মিজোরামের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিশ্বজিৎ দেব বিলটিকে সংবিধানের ৫ থেকে ১১ ও ১৪, ১৫ অনুচ্ছেদ বিরোধী বলে দেগে দিয়েছেন। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্ জোরালোভাষায় বলেছেন, বিলটি কোনোভাবেই সংবিধান বিরোধী নয়। তাঁর যুক্তি, সরকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী সংসদে নাগরিকত্ব আইন তৈরি করতে পারে; সেখানে ১৪তম অনুচ্ছেদের সমানাধিকার কোনো বাধা হতে পারে না। আমার মনে হয়, বিরোধী দলগুলির সম্ভাব্য অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এবং নাগরিকদের সঠিক আইনি অবস্থান জানানোর জন্য সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদগুলি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

ওই অনুচ্ছেদগুলি পরপর ব্যাখ্যা করা যাক। প্রথমেই আসা যাক সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫-য়ে যেখানে নাগরিকতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে কোনো ব্যক্তি যিনি সংবিধান প্রবর্তনের সময় (a) who was born in the territory of

India; or (b) either of whose parents was born in the terriory of India; or (c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding such commencement shall be a citizeen of India. এর পরে আসা যাক ১০নং অনুচ্ছেদে। ওই অনুচ্ছেদে যারা নাগরিক তাঁদের নাগরিকত্বের অধিকার কীভাবে চালু থাকবে তা আলোচিত হয়েছে। এখন আমরা আসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৪ নং অনুচ্ছেদে। এই অনুচ্ছেদটি হলো আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমানাধিকার সংক্রান্ত। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ''The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.'' এরপর 'নোট্স অন আর্টিকেল ১৪'-তে 'Citizenship' সংক্রান্ত অংশে বলা হয়েছে, Foreigners do not have a fundamental right to obtain Indian Citizenship. (vide David John Hopkins v. Union of India, AIR 1997 Mad 366 : 1997 Writ LR 681). পরবর্তী অংশে, Concept of Equality-তে বলা হয়েছে, ''Concept of equality connot be pressed to commit another wrong.'' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অনুচ্ছেদ ১৪-তে সমানতার কথা বলা হলেও তা নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং যারা বলছেন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করা, ওখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কেন নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না তাঁরা নিঃসন্দেহেই মিথ্যে চালাকি করতে চাইছেন। তাঁরা যারা অত্যাচার করেছে এবং যারা অত্যাচারিত হয়েছেন তাঁদের উভয়কেই একই পর্যায়ভুক্ত করতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বলেছেন, ''যারা মারে, তাঁরা ভুলে যায়; কিন্তু যারা মার খায় তাঁরা ভোলে না।'' সুতরাং, পূর্ববঙ্গে মার খেয়ে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুরা যে সেই মার খাওয়া ভোলেনি তা এই স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কারবারীদের মনে রাখতে হবে। এরপরে আসা যাক অনুচ্ছেদ ১৫-তে। সংবিধানের এই ১৫নং অনুচ্ছেদটি হলো ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থানের কারণে কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to–- (a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or (b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of general public. অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না তা পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে ১৫ নং

অনুচ্ছেদে। এক্ষেত্রে নাগরিকত্ব প্রদান সংক্রান্ত কোনো বিষয়ই নেই। সুতরাং নাগরিকত্ব কাকে দেওয়া হবে আর কাকে দেওয়া হবে না তা সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ধারিত হতে পারে না। অনুচ্ছেদ ২৫ এবং ২৬-য়ে স্বাধীনভাব প্রত্যেকের নিজের ধর্মাচরণ করা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত। এক্ষেত্রেও নাগরিকত্ব প্রদান সংক্রান্ত কোনো বিষয় এই অনুচ্ছেদ দুটির সঙ্গে যুক্ত নয় কোনোভাবেই। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫,১০,১৪, ১৫,২৫ এবং ২৬ নতুন নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ব্যাহত করে না বা বিরোধী নয়। এবারে আসা যাক ১১ নং অনুচ্ছেদ বিষয়ে। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক কী আছে এই অনুচ্ছেদে। এই অনুচ্ছেদটি হলো, Parliament to regulate the right of citizenship by law– Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship. অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় সংসদ আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কোনো অনুচ্ছেদই সংসদকে নাগরিকত্ব অর্জন এবং তা ছেদ করার আইন প্রণয়নসহ নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যে কোনো আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারে না। এক্ষেত্রে সংসদই 'সুপ্রিম'। সুতরাং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্ 'নাগরিকত্ব সংশোধনী' আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ১১ নং অনুচ্ছেদের যে যুক্তি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। সুতরাং এই 'নাগরিকত্ব সংশোধন আইন' পুরোপুরি সংবিধান অনুসারী। এছাড়া আইনটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৫১ সালে গৃহীত উদ্বাস্তু সংক্রান্ত কনভেনশনের ১৪নং অনুচ্ছেদের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। সেখানে 'উদ্বাস্তু'র সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war or violence. A refugee has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries. এখানে স্মর্তব্য যে, ঘোষিত ইসলামি রাষ্ট্র বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্থানে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অত্যাচারিত হবার কথা নয় ধর্মীয় কারণে। আর উপরোক্ত পাঁচটি কারণ ছাড়া অন্যকারণে কেউ দেশত্যাগ করে অন্য দেশে প্রবেশ করলে তাঁকে 'অনুপ্রবেশকারী' বলে ঘোষণা করা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওই কনভেনশনে।

এই প্রসঙ্গে কেন হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসি এবং খ্রিস্টানদের এই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কেন মুসলমান সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া হয়েছে তা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পরে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা গিয়েছিল স্ব স্ব দেশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ স্বাভাবিক শান্তি এবং সুস্থিতিতেই বসবাস করবেন অতঃপর। কিন্তু সেটা হয়নি। বিভক্ত ভারতে সেটা সম্ভব হলেও যে ধর্মীয় বিভাজনের কারণে পাকিস্তানের সৃষ্টি করা হয়েছিল সেটা বহাল তবিয়তে বর্তমান ছিল পাকিস্তানের দুটি অংশেই।

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু-বৌদ্ধ- শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে মেনে নিতে পারেনি। ফলে তাঁরা ধারাবাহিকভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ইত্যাদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপরে অত্যাচার, গণহত্যা, নারী সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন অব্যাহত রাখে। এরই ফলশ্রুতিতে ওই দেশগুলি এবং আফগানিস্তান থেকে ক্রমাগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের আজন্মলালিত দেশ থেকে বাস্তুত্যাগ করে বিভক্ত ভারতের এই অংশে আসতে বাধ্য হয়। এই উদ্বাস্তুপ্রবাহ রোধ করার জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন দু' দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও লিয়াকত আলি খাঁ; ৮ এপ্রিল, ১৯৫০-এ স্বাক্ষরিত হয় 'নেহরু-লিয়াকত' চুক্তি। এই চুক্তির ফলে এদেশ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানেরা আবার ফিরে এলেও, পাকিস্তান ত্যাগ করে চলে আসা কিছু হিন্দু ফিরে গেলেও তাঁরা যে আবার শুধু ফিরে আসে তাই নয়, তাঁদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে চলে আসে অবশিষ্ট হিন্দুরাও। আজও সে প্রবাহ থামেনি। জওহরলাল নেহরুর চুক্তি মুসলমানদের স্বস্তি দিলেও হিন্দুদের উপর অত্যাচার থামাতে পারেনি; তাঁদের বাস্তুত্যাগ চলেছে অবিরাম গতিতে। ১৯৭০-৭১ সালে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে; তারই ফলশ্রুতিতে স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়েছে 'ইন্দিরা-মুজিব' চুক্তি। কিন্তু মুজিবের তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' শাসনব্যবস্থাও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার থামতে পারেনি। ফল, যথা পূর্বং, তথা পরং। হিন্দুদের উপর অত্যাচার পুরোপুরি বহাল, উবাস্তু প্রবাহ আগের মতোই বলবৎ। প্রমথনাথ বিশীর সেই কবিতাই সবচেয়ে সত্যি— "আমিন ভালো, জমিন ভালো; ভালো শহর ঢাকা। সবার চাইতে ভালো রে ভাই, হিন্দু পল্লী ফাঁকা।" আর ভুললে চলবে না, এই ফাঁকা হিন্দু পল্লীর দখল কিন্তু নিয়েছে আরেক শ্রেণীর বাঙ্গালি, মুসলমান বাঙ্গালি। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে অনেক হিন্দু নেতা কেন অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদেরও এই নাগরিকত্ব আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলো না তাই নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন শুরু করেছেন। তাঁরা ওই দেশগুলির অত্যাচারী মুসলমান সম্প্রদায়কে অত্যাচারিত হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধদের সঙ্গে একই পঙক্তিতে বসাতে চাইছেন। যারা অত্যাচার করল, আর যারা অত্যাচারিত হলো— সবাই একই অধিকার পাবে? ■

চিঠিপত্র

দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে

গত ১৪ ডিসেম্বর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে চাপলাম কলকাতার উদ্দেশে। গাড়ি সময়মতো চলছিল হঠাৎ ওল্ড মালদাতে থামল প্রায় এক ঘণ্টা। ভাবলাম ক্রসিংয়ের জন্য হয়তো। অন্যকিছু ভাববার কথা মনে হয়নি ওই সময়। যাইহোক, সেখান থেকে ছেড়ে মালদা টাউনে পৌঁছোল একটা তিরিশ মিনিটে। ওইখানে একঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত হবার পর কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে ফারাক্কার ওপারে কোথাও এনআরসির বিরুদ্ধে বেশকিছু লোক বাসে আগুন লাগিয়েছে, ট্রেনেও আগুন লাগিয়েছে। মালদায় স্টেশনমাস্টার ঘনঘন ঘোষণা করছেন যে আধ ঘণ্টা বাদে জানানো হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া হবে কিনা। অগত্যা ঘোষণা হলো— কলকাতাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসটি গৌহাটি ফিরে যাচ্ছে। সেই আশায় বসে আছি কিন্তু ট্রেন ছাড়বার কোনো নাম নেই।

এইভাবে দু' ঘণ্টা অতিক্রম করার পর ঘোষণা হলো গৌহাটিগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বাতিল করা হলো। কী বিপদ! কোনো দিকেই যাচ্ছে না ট্রেন। ভীষণ ভয় হতে লাগল যদি মালদা টাউনে জেহাদিরা আক্রমণ করে ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেয়? একদম অপরিচিত জায়গা, পরিচিত নেই কেউই। এদিকে তো খাওয়া-দাওয়া সব লাটে উঠেছে। সন্ধ্যা হলো একে তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম বেশকিছু যাত্রী রয়েছেন কোচবিহারে যাবেন। সন্ধ্যে ছয়টায় চেন্নাই-গৌহাটি এক্সপ্রেস এলো, আধ ঘণ্টা বাদে কলকাতা-হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এসে দাঁড়াল। কোনো ট্রেনই যাচ্ছে না! শোনা গেল হরিশ্চচন্দ্রপুর স্টেশনে ট্রেন ভাঙচুর হয়েছে, আগুন জ্বালিয়েছে, লাইন উপড়ে ফেলেছে।

মনে মনে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলাম। এরপর ট্রেন দুটি ছাড়বার কথা ঘোষণা করা হলো। গাড়ি হরিশচন্দ্রপুর পৌঁছতে গা ছমছম করে উঠল। এক ব্যক্তি আগেই বলে গেছেন জানালা কেউ খোলা রাখবেন না। কিন্তু কৌতূহলী যাত্রীরা ওসব সতর্কবাণী মাথায় তুলে রেখে জানলা খুলে পোড়া ট্রেনটির ছবি তুলতে লাগল। রাত বারোটায় এনজেপিতে হলদিবাড়ি-কলকাতা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস পৌঁছল। আবার সেই ট্রেনের অপেক্ষায় রইলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে ঘোষণা হলো তিনটা চল্লিশ মিনিটে বেঙ্গালুরু-গৌহাটি এক্সপ্রেস আসছে। ঠিক ভোর সাড়ে পাঁচটায় নিউ কোচবিহারে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাত্রীদের এত দুর্ভোগ সত্ত্বেও রেলপুলিশের কোনোরকম সাহায্য পেলাম না। রেলপুলিশকে বললাম, আমরা এই পরিস্থিতির শিকার তবুও জেনারেল কম্পার্টমেন্টগুলিতে সুপারির বস্তা তোলার অনুমতি দিয়ে টাকা ঘুষ নিলেন।

এনআরসি ও নাগরিকত্ব আইনের বিষয়টি না বুঝেই যে রাজনীতি বিরোধী দলগুলি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে করেছে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করছে এরজন্য শান্তিপ্রিয়, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আগামী নির্বাচনে মোক্ষম জবাব দেবেন ইভিএমে। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বার বার বলছেন যে শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে আর শরণার্থী হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে তথাপি কংগ্রেস, সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক সর্বোপরি তৃণমূল ভুল বুঝিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে দাঙ্গা লাগাচ্ছে। জেহাদি মুসলমানরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ট্রেন বাস জ্বালিয়ে ভাঙচুর করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করল। কাউকে আটক করা হলো না এইভাবে এদের গুরুতর অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়া হলো। তাই, গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ নাগরিকরা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপে হতবাক্! রাস্তায় রাস্তায় বলাবলি হচ্ছে, 'মুখ্যমন্ত্রী যাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন ওই লুঙ্গিবাহিনী তাঁকে জব্দ করবেই'। কারণ সাপুড়িয়াদের সাপের ছোবলেই মৃত্যু হয়। দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে।

—**রাজু সরখেল,**
দিনহাটা, কোচবিহার।

ভুল

'বিশ্বামিত্র' তাঁর কলম-এ, (স্বস্তিকা, ২৫.১১.১৯), বলেছেন— 'প্রায় এক যুগ আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'অনুপ্রেরণা'য় তাঁর ক্রিকেট জগতের গুরু জগমোহন ডালমিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যান, ...দখলদারির সেই রাজনীতির বোড়ে সৌরভ নিজের ভুল বুঝতে পেরে ডালমিয়ার কাছে নিজের অনুতাপও প্রকাশ করেন'।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কখনও তাঁর পিতৃবন্ধু জগমোহন ডালমিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেননি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মদতে, যতদূর মনে পড়ে, কলকাতার তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার ডালমিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং হেরেছিলেন।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬১

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

স্ট্রোক থেকে বাঁচতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

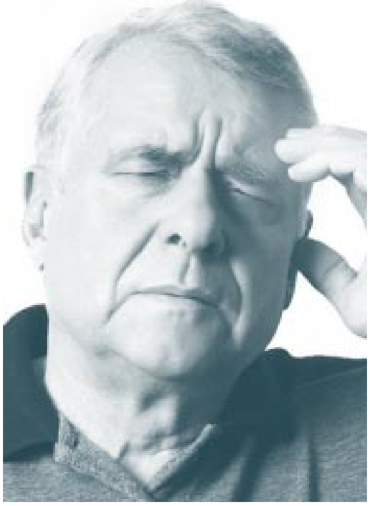

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বিশেষজ্ঞরা বলছেন কয়েকটি নিয়ম মেনে চললে এড়ানো যায় স্ট্রোক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। আর যদি পরিবার পরিজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কারও স্ট্রোক হয়ে থাকে তাহলে তো এই সম্ভাবনা আরও বেশি তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে কী করবেন? কীভাবে আটকাবেন? হ্যাঁ, পরিবারের ইতিহাস তো বদলানো সম্ভব নয়। যেটা সম্ভব, সেটা হলো সেই সব ঝুঁকির কারণ সম্পর্কে অবহিত এবং সচেতন থাকা, যা স্ট্রোক ডেকে আনে। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের নিউরোলজির সরকারি অধ্যাপক তথা ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটালের 'অ্যাকিউট স্ট্রোক সার্ভিস'-এর সহকারী অধিকর্তা, ডাঃ নাতালিয়া রস্ট বিশদে জানাচ্ছেন সেই সব নিয়ামক সম্বন্ধেই। তাঁর কথায়, যা যা বিপদ ডেকে আনতে পারে, তার সম্বন্ধে যদি আগে থেকে জেনে যান, প্রতিরোধ করতে সুবিধাই হবে। সেই নিয়ম মেনেই স্ট্রোক হওয়া এড়াতে আগাম সতর্কতা অবলম্বন করুন। এতে আপনারই মঙ্গল হবে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন : হাই ব্লাড প্রেসার থাকলে এখনই সাবধান হন। সঠিক সময়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না আনলে মুশকিল বাড়বে। স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। আর এটা পুরুষ এবং মহিলা, উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ড. রস্টের মতে, নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করুন। বাড়তে থাকলে সত্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। লক্ষ্য রাখুন রক্তচাপ যেন থাকে ১৩৫/৮৫। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হওয়া উচিত ১৪০/৯০। খাবারে নুনের মাত্রা কম করুন। কোনওভাবেই তা যেন দিনে ১,৫০০ মিলিগ্রামের বেশি না হয় (অর্ধেক চামচ)। হাই কোলেস্টেরল যুক্ত খাবার বর্জন করুন। যেমন বার্গার, চিজ এবং আইসক্রিম। প্রতিদিন অন্তত চার থেকে পাঁচ গ্লাস জল, ফলমূল এবং শাক সবজি রাখুন। সঙ্গে সপ্তাহে দু থেকে তিন দিন মাছ। নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট। ধূমপান বর্জন করুন। প্রয়োজনে ওষুধ খান।

ওজন কমান : মনে রাখবেন, আজকের দিনে স্থূলতা, শুধু অসময়ের স্ট্রোক নয়, আরও অনেক রোগ জ্বালা ডেকে আনে। তাই যদি ওজন বেশি থাকে, অবশ্যই বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ফেলুন। অন্তত ১০ পাউন্ড তো বটেই। এতে স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। আদর্শ বডি মাস ইনডেক্স বা বিএমআই হলো ২৫ বা তার কম। কী করে সম্ভব? দিনে কখনওই ১,৫০০ থেকে ২,০০০ ক্যালরির বেশি খাবার গ্রহণ করবেন না। শরীরচর্চার সময় বাড়ান। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুন। গলফ খেলুন, টেনিস খেলুন। শরীরকে যতটা সম্ভব ফিট রাখুন।

বেশি করে শরীরচর্চা করুন : নিয়মিত শরীরচর্চা এবং ব্যায়াম করলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কাও অনেকাংশে হ্রাস পায়।

কী করে সম্ভব?

শুরুটা অন্তত করুন। আর কিছু না পারলেও প্রাতঃরাশ সেরে বরং প্রতিদিন সকালে আপনার পাড়াতেই চক্কর কাটুন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে একটা ফিটনেস ক্লাব গড়ে তুলুন। এতে একে অন্যের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখতে পারবেন। শরীরচর্চা ততক্ষণ করুন, যতক্ষণ না শ্বাস ফুলে আসে, কিন্তু কথা বলতে কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। এই স্টেজে পৌঁছালেই ধীরে ধীরে রিল্যাক্স করুন। লিফট না নিয়ে সিঁড়ি ব্যবহার করুন। যদি হাতে টানা ৩০ মিনিটও সময় না থাকে, সময়টাকে ছোটো ছোটো ব্যবধানে ভাগ করে নিন। দশ পনেরো মিনিট করে কসরত করুন।

মদ্যপানে লাগাম টানুন : ধূমপানের মতো অবাধ মদ্যপানও স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হারে বাড়িয়ে দেয়। ড. রুস্ট বলেছেন, দিনে একটা ড্রিঙ্ক নিলে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু এই হার বেড়ে দুই বা তার বেশি হলেই বিপদ বাড়তে থাকবে।

আর্টারিয়াল ফাইব্রিলেশন : হার্ট বিট যদি অনিয়মিত গতিতে হয়, হৃৎপিণ্ডে ক্লট তৈরি হতে পারে। এই ক্লট মস্তিষ্কে পৌঁছে গেলে, স্ট্রোক ডেকে আনতে সক্ষম। কাজেই এক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া অত্যন্ত জরুরি। লক্ষ্য কী? আর্টারিয়াল থাকলে চিকিৎসা করান। অল্পতেই বুক ধড়ফড় করলে বা শ্বাসকষ্ট হলে চিকিৎসকের কাছে যান। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ওষুধ সেবন করতে হতে পারে, যেমন ওয়ারফারিন (কৌমাডিন)। ওষুধপত্র যাই নেবেন, অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে। ∎

উনিশের প্রাপ্তি
মোদী সরকারের সাহসী কূটনীতি

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৯ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে বরাবরের মতোই বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলিতে দেশের বিগত বছরের নানান সাফল্য-ব্যর্থতা তুলে ধরা হচ্ছে। বছরের একেবারে শেষ লগ্নে বক্সার মেরি কমের অলিম্পিক লড়াইয়ের যোগ্যতা অর্জন এমনই একটি বড়ো সাফল্য। বছরের সালতামামি করতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেরই নমুনা উঠে আসছে। এই সূত্রে যে বিষয়টি পরিধির বাইরে থেকে যাচ্ছে তা হলো আন্তর্জাতিক কূটনীতি ক্ষেত্র। বছরের শুরুতে সীমানা পার করে বালাকোটে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করা সকলে দেখেছেন। কিন্তু এটি যে পররাষ্ট্র আক্রমণ নয় কেবলমাত্র দেশের নিরাপত্তা রক্ষার্থেই সংঘঠিত হয়েছিল তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রবল শক্তিধর মার্কিন ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মাতব্বরদের বোঝানো ছোটো বিষয় নয়। একই সঙ্গে চিরশত্রু দেশ চীন ও পাকিস্তানের চূড়ান্ত বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে ভারতের কূটনীতিবিদরা এ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে মাথা ঘামানো থেকে বিরত রাখতে সফল হন।

১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় জঙ্গিদের আরডিএক্স বোঝাই ট্রাকের আক্রমণে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হওয়ার পর, ভারত থেমে থাকেনি। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ ঐতিহাসিক বালাকোট বোমা বর্ষণ হয়। আশ্চর্যের বিষয় এর দুদিন আগে ২৪/২-এ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো টুইট করেন, "India is looking at something very strong. And I mean India has lost almost 50 people by an attack. So I could understand the situation also (TOI 24.2.2019)। যেন তিনি সম্ভাব্য প্রত্যাঘাত সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। তাই হয়তো এই প্রচ্ছন্ন সমর্থন।

এরই কিছু আগে কুখ্যাত লস্কর-এ-তৈবা প্রধান হাফিজ মহম্মদ সইদের নাম UNSC-র ১২৬৭ জনের কালো তালিকা থেকে বাদ দিতে পাকিস্তান Counter Terrorism কমিটির কাছে প্রবল তদ্বির করেও ব্যর্থ হয়। অবশ্য তার বাজেয়াপ্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কাজটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। কেননা পুলওয়ামা বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা পরিষদের সাত দিন লেগেছিল ঘটনার নিন্দা করতে। আর এই প্রথম জম্মু কাশ্মীরে কোনো সন্ত্রাসী হামলায় নিরাপত্তা পরিষদ সরাসরি নিন্দা করেছিল।

অনেকেরই মনে পড়বে মে মাস নাগাদ পাক-ভারত সীমান্তে সেনা মোতায়েন করা বাড়তে থাকে। দু' দেশের মধ্যে সংঘর্ষের আবহ ঘনিয়ে আসছিল। এই সময় পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়াতে আর এক ভয়ঙ্কর জঙ্গি পাকিস্তানবাসী 'জইশ-ই-মহম্মদ' নেতা মাসুদ আজহারকে নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষণা করে। অতীতে চারবার এ চেষ্টা হলেও চীনের ভেটো প্রয়োগে তা আটকে গেছে। কিন্তু এবার পেরে উঠল না। এর পেছনে রয়েছে ইউএনএসসি-তে ভারতের ক্ষুরধার মস্তিষ্কের কূটনীতিক সঈদ আকবরুদ্দিনের সফল দৌত্য। এই সাফল্যের পর তিনি লিখেছিলেন "Big small all join together– Masood Azhar designated as a terrorist in UN sanctions list. Grateful to all for their support." কূটনৈতিক সফলতা দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপরও বড়ো প্রভাব ফেলে। যেমন কূটনৈতিকভাবে যত বেশি দেশের সঙ্গে দৌত্য সফল হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চাপ কমে যায়। বিরোধ কেটে যাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুদৃঢ় হয়। পক্ষান্তরে অর্থনীতির বুনিয়াদ ও বৃদ্ধির গতি বাড়ে। কূটনৈতিক সাফল্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের চোখে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিরও সহায়ক। দেশের এই সম্মান বৃদ্ধি সামাজিকভাবে নাগরিকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এর প্রভাব গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়াতেও পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৭০ বছর ধরে আটকে থাকা চরম বৈষম্যমূলক ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার সময়ও দেশকে এক চরম পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছিল। পাকিস্তান চীনকে দোসর করে কাশ্মীরের এই ঢেলে সাজা ও নির্দিষ্ট স্বার্থান্বেষীদের সুবিধাভোগকে জারি রাখার

প্রসঙ্গ এড়িয়ে এটিকে ভারতের পাকিস্তানের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন যুদ্ধ হুঙ্কার ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখলের যুদ্ধ পরিকল্পনা বলে চালাবার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে দাপাদাপি করতে থাকে। এই প্রথম কাশ্মীরের দ্বিপাক্ষিক বিষয় ‘বদ্ধ কক্ষে’ আলোচিত হয়। কিন্তু এই কূটনৈতিক দৌত্য সফল করতে আমেরিকা প্রভাব খাটিয়ে স্থায়ী সদস্য রাশিয়া ও ফ্রান্সকে পাশে নিয়ে ঘরের আলোচনা ঘরেই পচিয়ে দেয়। প্রকাশ্য ঘোষণা হয় বিষয়টি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বারবার চিঠি পাঠিয়েছে। নাছোড়বান্দা চীন বন্ধুকে রক্ষা করতে তাদের Xinxiang প্রদেশে উইঘুর মুসলমানদের ওপর লাগাতার নিপীড়ন চালিয়ে ধারাবাহিক ধর্মান্তর, প্রার্থনা পরিবর্তন ও কয়েক মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে ধর্মহীন করে তোলার যে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে তা ভুলে গিয়ে ভারতে কাশ্মীরিদের বন্ধক করে রাখার অভিযোগ ডিসেম্বরেই আবার তুলেছে। UNSC-র বর্তমান মার্কিন সভাপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তা পত্রপাট নাকচ করে দিয়েছেন।

আকবরুদ্দিন ও তাঁর সঙ্গীরা এক্ষেত্রেও দীর্ঘ মত বিনিময়ের মাধ্যমেই এই সাফল্য নিয়ে এসেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় ভারত তার এমন মহাগুরত্বপূর্ণ পদ কত নিশ্চিন্তে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে অর্পণ করেছে যেখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান একই ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রধান দেশ। এটিই ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ। এরই ফলিত রূপ হিসেবে পাকিস্তানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কুলভূষণ যাদবকে আন্তর্জাতিক আদালতে হরিশ সালভে জিতিয়ে এনেছেন। তবে, একথা অনস্বীকার্য কূটনীতির সঙ্গে অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের নিবিড়তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১০টি এশীয় দেশের Regional Comprehensive Economic Partnership থেকে ভারত সরে এসেছে (স্বস্তিকায় এ বিষয়ে লেখা হয়েছে), যাতে সস্তার চীনা মাল ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে অলাভজনক না করে দেয়। দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশারদ কূটনীতিক এস জয়শঙ্করকে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ দপ্তরে এনেছেন। জয়শঙ্কর উল্লেখিত RCEP-এর বাইরে Free Trade Agreement-এর দেশগুলির সঙ্গে রপ্তানির জটিল কূটনৈতিক আলোচনা চালাচ্ছেন যাতে রপ্তানি না মার খায়। তিনি বলেছেন, ‘‘the economy drives diplomacy’’ —এই সূত্রে তিনি ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে ইতিবাচক দৌত্যে লিপ্ত। সামরিক অভিযান, রাজনৈতিক তর্জা, ধর্মীয় বিবাদ সামনে আসে। কিন্তু এবিষয়ে নির্ণায়ক ক্ষমতার অধিকারী কূটনীতি থাকে নেপথ্যে। তার সাফল্য ব্যর্থতা আমাদের মাতৃভাষার সংবাদমাধ্যম বা চ্যানেলগুলিতে খুব কমই জায়গা পায়। বুদ্ধির কারবারি আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এই সব ইতিবাচক খবর নিয়ে মাথা ঘামান না। উল্টে কাক- সংগীতের কাঁসরের তালে তাল মিলিয়ে আখের গোছাতে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করেন।

পরলোকে ডাঃ সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া মহানগরের পূর্বতন মহানগর সঙ্ঘচালক ডাঃ সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯, সোমাবার, ভোর ৫টায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

সুধীরদা ১৯৬৪ সালে পরমপূজনীয় গুরুজীর উপস্থিতিতে হাওড়া মহানগরের সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিষ্ঠার সঙ্গে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল হাওড়া মহানগরের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মহানগর সঙ্ঘচালক রূপে কাজ করে এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। সুধীরদা হাওড়া শহরে নাম করা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন। মৃদুভাষী, সুবক্তা, ধ্রুপদী সঙ্গীতে সুগায়ক হিসেবে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, এক পুত্র, দুই কন্যা ও সাত নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেও তিনি সমান ভাবে পারদর্শী ছিলেন। দীর্ঘদিন মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এবং হসপিটালে অধ্যাপনার কাজ করেছেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়ান, হাওড়া মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশন, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডার, বিবেকানন্দ আশ্রম, মেডিসিন ব্যাঙ্ক, দীননাথ মিশ্র সদন, শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। হাওড়া মহানগরের কার্যালয় ‘কেশব স্মৃতি’তে হাওড়ার বহু স্বয়ংসেবক ও বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তার মরদেহে পুষ্প ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। শেষে অন্তিম প্রণাম ও সঙ্ঘের প্রার্থনা দিয়ে তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হয়।

শোক সংবাদ

কাটোয়া নগরের ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কার্যকর্তা জিৎ চ্যাটার্জির দাদু গত ২২ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

* * *

মালদহ জেলার গাজোল খণ্ডের বৌদ্ধিক প্রমুখ তথা গাজোল সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্য আনন্দমোহন তরফদারের পিতৃদেব হরিদাস তরফদার গত ৩১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তিনি ১ পুত্র ৩ কন্যা, নাতি, নাতনি, জামাতা ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

নাগরিকত্ব আইন সীমান্তবর্তী এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুর রক্ষাকবচ

গীরেন্দ্রনাথ বর্মণ

বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনীতি CAA অর্থাৎ Citizenship Amendment Act নিয়ে তোলপাড়। এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে সেকুলারবাদী এবং কমিউনিস্ট দলগুলো সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

আসলে আইনটি কী? কেন? তা না বুঝেই ভোটভিক্ষুক দলগুলো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে মিথ্যে প্রচার করে উস্কে দিচ্ছে। যার ফলস্বরূপ কিছুদিন আগে আইনের বিরোধিতার নামে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের ঢালাও প্রতিযোগিতা দেখলাম।

আইনটির মূলকথা কারো নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া নয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি সংখ্যালঘু মানুষদের এদেশে নাগরিকত্ব প্রদান। এটা ভারত সরকার নতুনভাবে করছে না। এর আগে নেহরু লিয়াকত চুক্তিতেই এর উল্লেখ আছে।

এতদিন আমরা আমাদের এইসব অঞ্চলে কী দেখেছি? বিশেষত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় ওপার বাংলার রংপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের রাজবংশী ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা উদ্বাস্তু হয়ে বসবাস করে। বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলি শহর অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবনযাপন করছে। ওপার বাংলায় কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষরা যারা অধিকাংশ নমঃশূদ্র ও রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত তারা এই অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় একপ্রকার সরকারি সুযোগ সুবিধাহীন অবস্থায় বসবাস করেছে। নিজের দেশ থেকে নিঃসহায় পরিবারগুলো এদেশে এসে শাসকদলের খপ্পরে পড়ে যেত। কেননা সর্বস্ব ফেলে ওখান থেকে অতিকষ্টে আসার পর তাদের মানসিক শক্তি তলানিতে। এখানে এসে শাসকদলের কোপে পড়তে ভয় পেত। আর শাসকদল তাদের ভোটাধিকার, রেশনকার্ড ইত্যাদির জুজু দেখিয়ে তাদের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করত। তাই এই মানুষগুলোকে নাগরিকত্ব দেওয়া হলে তাদের ভোটব্যাঙ্ক নষ্ট হবে, তাই বিরোধিতা করছে। শাসকদল ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে আসা রাজবংশী, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ সম্মান ও স্বাভিমানের সঙ্গে বাঁচুক তা চায় না।

আরও বড়ো কথা, যদি কেন্দ্র সরকার নাগরিকত্ব আইন করে এনআরসি লাগু না করতে পারে, তবে আগামীতে এই অঞ্চলগুলোতে প্রচণ্ড সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যা ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। বিশেষত কোচবিহার জেলার সিতাই-শীতলখুচি সীমান্তরেখা অঞ্চলে। ওপার বাঙ্গলার রাজবংশী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষরাই এই অঞ্চলের উদ্বাস্তু শ্রেণী। জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতার কারণে এই অঞ্চলে প্রচণ্ড হারে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসব অঞ্চলে ১৫/২০ বছর আগে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, আজকে অনেক অঞ্চলেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু। বিশেষত শীতলখুচি ব্লকের বড়ো মরিচা, গোলেনাওহাটি লালবাজার অঞ্চলে হিন্দু সংখ্যালঘু। এইসব অঞ্চলের যারা বর্ধিষ্ণু হিন্দুপরিবার তারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন শহরে বাড়িঘর কিনে চলে যাচ্ছে।

ওইসব অঞ্চলের হিন্দুদের সঙ্গে কথা বললে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক প্রকাশ পায়। যারা ব্যবসাবাণিজ্যের কারণে আসতে পারছে না, তারা খেয়ে না খেয়ে বাড়িঘর না করে বাড়ির চারদিকে দেওয়াল দিচ্ছে। বাড়ির সদর দরজা শক্ত করছে। জিজ্ঞাসা করলে বলছে যে মুসলমানরা আক্রমণ করলে দরজা ভাঙতে ভাঙতে পুলিশকে খবর দিতে পারবে, সেই জন্য দরজা শক্ত করা।

বর্তমান ভারত সরকার নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি নিয়ে যে পদক্ষেপ নিয়েছে, এই অঞ্চলের হিন্দুরা এর দিকেই তাকিয়ে আছে। বুকভরা বেদনা এবং আশাভরা স্বপ্নে এই অঞ্চলের নির্যাতিত- নিপীড়িত রাজবংশী, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় আগামী নিরাপদ জীবনের দিকে তাকিয়ে আছে। ▌

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও উত্তরবঙ্গের জনভাবনা

ইন্দ্রমোহন রাভা

গণতন্ত্রে ভিন্নমত স্বীকৃত। আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক প্রশস্ত। পরে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে গৃহীত হয় সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি সংশোধনী নাগরিকত্ব বিল নিয়ে ভারতীয় সংসদে সেটাই ঘটেছে। মহামহিম রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের দ্বারা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সেটি এখন বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত না মানা বা অস্বীকার করা গণতন্ত্রের মৌলিক শর্তকে ক্ষুণ্ণ করে এবং বিধিবদ্ধ আইনকে অস্বীকার করাটা সংবিধানিক বিধি ভঙ্গের শামিল। অথচ আমরা দেখছি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ মদতে বিগত কয়েকদিন ধরে ঠিক সেটাই ঘটে চলেছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তার প্রত্যক্ষ আহ্বানে ও মদতে হার্মাদ ও জেহাদিবাহিনী ডাইরেক্ট অ্যাকশনে নেমে গেছে এবং একের পর এক সারিবদ্ধ বাসে, অটোয়, লরিতে এমনকী রেলগাড়িতে অগ্নি-সংযোগ করা হয়েছে। যেভাবে স্টেশনে ভাঙচুর, লুট করা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে বাড়িঘর, দোকান, ভাঙচুর ও লুঠ করা হয়েছে তাতে স্বাধীনতাপূর্ব মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের স্মৃতি জাগরিত হচ্ছে। সেদিন মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবিকে যারা সমর্থন করেছিল, যারা ক্ষমতার লোভে সেই দাবি মেনে নিয়েছিল এবং যারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শামিল হয়েছিল— ঠিক তারাই আজ ভারত জুড়ে একইরকম ভাবে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় ময়দানে নেমেছে। সেদিনের সুরাবর্দির ভূমিকায় আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখতে পাচ্ছি। মহম্মদ আলি জিন্নার জিন যেন মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধে ভর করেছে। তিনি আওয়াজ তুলেছেন--- 'বাঙ্গলায় No CAB No NRC, No CAA, No NPR–এখানে ওসব চলবে না। পশ্চিমবঙ্গে সবাই নাগরিক।'

এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতাই হতে চলেছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মমতার ট্রাম্প কার্ড। তাই তিনি নতুন ভাবে উজ্জীবিত হয়ে প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আন্দোলনে নেমেছেন। প্রতি ব্লকে ব্লকে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় তিনি এত তেড়েফুঁড়ে নেমেছেন কেন? কারণ এছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই। একের পর এক আর্থিক দুর্নীতিতে তিনি ও তাঁর দল জড়িয়ে গেছে। সারদা মামলায় পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় তাঁর রাতের ঘুম উবে গিয়েছে। সারদা, রোজভ্যালি, নারদায় বড়ো বড়ো টিএমসি নেতা জড়িত হয়ে পড়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে সীমাহীন দুর্নীতি ধরা পড়েছে। তোলাবাজি, কাটমানি, ঘুষমানিতে পুরো দলটাই আকণ্ঠ নিমজ্জিত। লাগামহীন সন্ত্রাসে গ্রামবাঙ্গলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা রীতিমতো ব্যাহত হয়ে পড়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি তাঁর ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসন জিতে বিজেপি তাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এহেন দিশাহীন পরিস্থিতিতে এনআরসি এবং সিএএ বিরোধিতার সুবর্ণ সুযোগ তাকে বেঁচে থাকার এবং ভেসে থাকার অক্সিজেন জুগিয়েছে। তাই সরকার বিরোধী জ্বলন্ত ইস্যুগুলিকে ধামাচাপা দেবার মওকা তিনি হাতছাড়া করবেন না— এটাই স্বাভাবিক। জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জিহাদি চেতনাকে উস্কিয়ে দিয়ে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ককে সুরক্ষিত রাখা এবং বিভ্রান্তির মাধ্যমে হিন্দু উদ্বাস্তু ভোটকে বিজেপির দিকে সংগঠিত হওয়া রদ করার জন্য তিনি আগামী ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চালাতে থাকবেন। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির এই সুপরিকল্পিত অপপ্রচারের মোকাবিলায় বিজেপি যদি রাজ্যের মূল ইস্যুগুলিকে ভুলে যায় এবং জনগণের মধ্যে ইস্যুগুলিকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয় তাহলে গোটা রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে যাবে।

এই প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ কী ভাবছে তার উল্লেখ নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসগত দিক থেকে পূর্বতন দেশীয়রাজ্য কোচবিহার

এবং নিম্ন অসমের আদি জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে নিকট সম্পর্ক রয়েছে। উল্লেখ্য যে, নিম্ন অসমের বিস্তীর্ণ এলাকা এক সময় পূর্বতন কোচরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানেও উভয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের মধ্যে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম, বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাসে যথেষ্ট মিল থাকার কারণে এবং বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত জনগোষ্ঠীর মানুষদের অভিবাসন ও বসতি স্থাপন জনিত আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক মনোভাবনার মধ্যেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

অতীতে অসমীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গও চেয়েছিলেন--- কোচবিহার অংশ যেন অসমের সঙ্গে যুক্ত হয়। সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ।

পূর্বে অসমে বাঙ্গালি খেদাও আন্দোলনের ঢেউ উত্তরবঙ্গের দেশীয় এলাকায় আছড়ে পড়েছিল এবং স্থানীয় বৃহত্তম রাজবংশী সমাজের একাংশকে আতঙ্কিত করেছিল, বর্তমানেও অসমে এনআরসি নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে এবং সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে--- তার অভিঘাতে স্থানীয় অধিবাসীদের একাংশও প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। অসমবাসীদের সুরে তারাও বলতে শুরু করেছে— আমরা এনআরসি চাই, কিন্তু নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন চাই না। কারণ স্পষ্ট। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে (বর্তমানে বাংলাদেশ) আগত উদ্বাস্তু স্রোত তাদের জায়গা জমি, সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য হারানোর আশঙ্কায় আশঙ্কিত করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে কাজ হারানোর জন্য জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকাও ছিল।

তাই আঞ্চলিক দাবি দাওয়া আদায় ও নিজেদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার তাড়নায় কয়েকটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলি কিছুটা হলেও স্থানীয় রাজবংশী মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। অতীতে এতদঞ্চলে তপশিলি আন্দোলন, কামতাপুরি আন্দোলনে বহু মানুষকে শামিল হতে দেখা গিয়েছে। কখনও কখনও সেই সমস্ত আন্দোলন হিংসাত্মক চেহারাও নিয়েছে। অতি সম্প্রতি বৃহত্তর কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে গড়ে ওঠা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন বংশীবদন গোষ্ঠী এই আইনের বিরোধিতা করে কোচবিহার শহরে বড়ো মিছিলের আয়োজন করেছিল। যেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু মানুষকে পা মেলাতে দেখা গিয়েছিল। তথ্যসূত্রে জানা গেছে যে, এধরনের আঞ্চলিক ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি সংগঠন একসঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পর্দার আড়ালে অবশ্যই ক্ষমতাসীন দলটির ইন্ধন রয়েছে।

আঞ্চলিক ভাবাবেগ পুষ্ট ছোটো ছোটো দল বা গোষ্ঠীগুলোর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী প্রচার ও মিছিল সত্ত্বেও এবং রাজনৈতিক ভাবে কোণঠাসা ও দিশাহীন মুখ্যমন্ত্রীর বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার সত্ত্বেও সাধারণ রাজবংশী ও জনজাতি মানুষ এই আইনকে স্বাগত জানাচ্ছে। গত ৩০ ডিসেম্বর কোচবিহার শহরে ঐতিহাসিক অভিনন্দন মহামিছিল তার সাক্ষ্য বহন করছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দীর্ঘকাল ধরে একসঙ্গে বসবাস করার কারণে এবং জনগোষ্ঠীগত ভাবে স্থানীয় রাজবংশী হিন্দু ও স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ। আসলে স্থানীয় মুসলমান (দেশি মুসলমান) শ্রেণী ধর্মান্তরিত রাজবংশী সমাজেরই মানুষ। ফলে দেশীয় ভাবাবেগ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। সেজন্য উভয়ের কাছেই পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু হিন্দু ভিন্ন প্রজাতির বলে প্রতীয়মান হয়। এই ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার কাজটি করে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

কিন্তু সময়ের স্রোতে মানুষ ভেসে চলে। আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় বিশাল জনগোষ্ঠী একসঙ্গে একই লক্ষ্যে এগুতে থাকে। ফলস্বরূপ আঞ্চলিক ভাবাবেগ বা খণ্ড জাতীয়তার আবেগ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে।

আঞ্চলিক স্তরে ক্ষুদ্র ও খণ্ড জাতীয়তার পরিসর বৃদ্ধি ঘটিয়ে বৃহত্তর জাতীয়তার স্রোতে সাধারণ মানুষকে মিলিয়ে দিতে যে রাষ্ট্রীয় ভাবনার প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজন হয় তা করে দেখিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং তার সহমর্মী রাষ্ট্রবাদী সংগঠনগুলো। মূলত এই সংগঠনগুলির লাগাতার প্রচার ও সাংগঠনিক কাজকর্মের ফলে এই ভূভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ সর্বভারতীয় আঙ্গিকের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পেরেছে।

এখন উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যার সুফল গত লোকসভা নির্বাচনে (২০১৯) দল পেয়েছে। উত্তরবঙ্গের ৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৭টিতেই বিজেপি জয়লাভ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, আঞ্চলিক ভাবাবেগ পুষ্ট ছোটো ছোটো দল বা গোষ্ঠীগুলোর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী প্রচার ও মিছিল সত্ত্বেও এবং রাজনৈতিক ভাবে কোণঠাসা ও দিশাহীন মুখ্যমন্ত্রীর বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার সত্ত্বেও সাধারণ রাজবংশী ও জনজাতি মানুষ এই আইনকে স্বাগত জানাচ্ছে। গত ৩০ ডিসেম্বর কোচবিহার শহরে ঐতিহাসিক অভিনন্দন মহামিছিল তার সাক্ষ্য বহন করছে। ■

মোদীজী পারেন ভোটব্যাঙ্কের কথা না ভেবে কিছু করতে

পূর্বা চৌধুরী

এবারেও অবলম্বন সেই রবীন্দ্রনাথ। তুমি বিনে চলে না হে কবি। যে প্রশ্ন তুমি তুলেছিলে বিশ্বকবি আজও যে সেই প্রশ্নটাই এই ঘুণধরা গণতান্ত্রিক কাঠামোতে মাথাকুটে মরছে— ''নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবারে কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা?''

কথায় কথায় গণতন্ত্র আর সেকুলারিজমের ধ্বজাধারীরা এখন কোথায়? চমকে উঠলাম খোলা বাক্সটার দিকে তাকিয়ে অর্ধদগ্ধ এক নারীদেহ কামনার শিকার কিছু মত্ত মানুষের। তেলেঙ্গনার সামসানদের টোলপ্লাজার আন্ডারপাসের নীচে। ২৬ বছরের পশুচিকিৎসক তরুণী প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি কল্লরু গ্রামের এক পশুচিকিৎসালয়ের চিকিৎসক তিনি। মত্ত চার ট্রাককর্মী মহম্মদ তারিফ (২৬), জল্মুদিন (২০), জল্লুনবীন (২০) এবং চিনুকস্তু (২০)-র লালসার শিকার। এ যেন বিখ্যাত টিভি. সিরিয়াল 'ক্রাইম পেট্রল'-এ সাজানো এক গল্প। কিন্তু এ গল্পের স্ক্রিপ্ট রাইটার কে? গণতন্ত্র না সেকুলারিজম? সামসাবাদ থেকে হায়দারবাদ ৫০ কিলোমিটার নিখুঁত স্ক্রিপ্ট। পশুচিকিৎসক মেয়েটির স্কুটারের চাকা ফুটো করে দিয়ে সেই গাড়ি সারিয়ে দেওয়ার মিথ্যা নাটক করে এদেরই একজন ঘুরে এল গাড়ি নিয়ে। এসে বললো মিস্ত্রী পাওয়া গেল না। ঘড়িতে রাত ৯টা। অযাচিত এত লোক দেখে ভালো লাগেনি প্রিয়াঙ্কার। বোনকে ফোন করে জানায় সেকথা। বোন পরামর্শ দেয় স্কুটার রেখে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে আসতে। তাই হয়তো করতে চেয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু সুযোগ পেল না। ঘড়িতে ৯.৪৫। মেয়েটির ফোন সুইচ অফ্ তখন থেকেই। আর তার পরদিন শামসাবাদের আউটার রিংরোডের আন্ডারপাসের নীচে চারজন মত্ত যুবক গণধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ডাঃ রেড্ডিকে। তারপর এদিক ওদিক খুঁজে পেট্রল যা পাওয়া গেল তা ঢেলে পুড়িয়ে দিল তরুণীকে। স্কুটারের নেমপ্লেট খুলে ফেলে দেওয়া হল অন্য জায়গায়। লালসা এবং খুন একইসঙ্গে দুই ক্রাইম মানবতার চরমলজ্জা।

নারকীয় এই ঘটনা মনে করিয়ে দিল দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডকে। মনে পড়ে যায় কলকাতার পার্কস্ট্রিটের সুজানের গণধর্ষণের ঘটনাকে।

মেয়েটির পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে মেয়ে না ফেরায় রাত ১০টাতে উদ্‌ভ্রান্ত বাবা মেয়েটির খোঁজে ডায়েরি করতে বিভিন্ন থানায় ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তু কোনো থানা ডায়েরি নেয়নি। শেষে যখন ডায়েরি নিল তার মাঝে প্রায় ৫ থেকে ৬ ঘন্টা সময় অতিবাহিত। মহম্মদ মাহমুদ আলি তেলেঙ্গনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য নিগৃহীতা মহিলা শিক্ষিতা হয়েও ১০০ নম্বরে ডায়েল না করে বোনকে ফোন করলো কেন? এরই মধ্যে তেলেঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রীকে ক্যাবিনেটের মন্ত্রী সদস্যদের নিয়ে টি আর এস বিধায়ক রেখা নায়েকের মেয়ের বিয়ের হাইপ্রোফাইল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা গেল। এতবড় জঘন্য ঘটনা, সারাদেশ উত্তাল, কোনো বক্তব্য এল না তেলেঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। বর্ষীয়ান সমাজবাদী নেত্রীর নিদান সংসদ ভবনে দোষীদের জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হোক, পিটিয়ে মারা হোক। আর এক পরিহাস! আইন নিজের হাতে তুলে নিতে সংসদ ভবনে বসে জনপ্রতিনিধি কী করে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেন? প্রশ্ন অনেক। দিল্লির নির্ভয়া থেকে প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি অজস্র গণধর্ষণের খবর, প্রশাসন কী করছে? টোলপ্লাজার মতো জায়গায় কোনো পুলিশ নেই কেন তেলেঙ্গনায়? ১০০ নম্বরে ডায়াল করলেই কি পুলিশ এসে যেত? খোদ কলকাতায় কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি এক গায়িকা রাতের বেলায় ফেরার সময় শিকার হয়েছিলেন কিছু গুন্ডা বদমায়েশের। তিনি ছুটে গিয়েছিলেন থানায়। থানা কি তখন তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল? এ থানা বলছে আমার এরিয়ায় এটা হয়নি, যেখানে ঘটনা ঘটেছে আপনি সেই এরিয়ার থানায় যান। পুলিশ প্রশাসন রাতের বেলায় একটি মেয়েকে আগে নিরাপত্তা দেবে না থানার এক্তিয়ার দেখবে? কোনটা? কালীঘাটের মতো জায়গা যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকেন হাই প্রোফাইল জায়গা সেখানে দুই নাবালিকা ধর্ষিতা হয় কী করে? সেখানে প্রশাসন কোথায়? তেলেঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেউ কি দুঃখপ্রকাশ করেছেন? পার্কস্ট্রিটের ঘটনায় আমরা দেখেছিলাম দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা পুলিশ অফিসার তদন্তের মূলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর? সাতবছর এমন এক ডিপার্টমেন্টে রাখা হলো দময়ন্তী সেনকে তিনি হয়ে গেলেন নিষ্ক্রিয়। কেন? অথচ তাপসী মালিক কিন্তু ক্ষমতায় আসার হাতিয়ার। তাহলে কি আমরা এটাই ধরে নিতে পারি না যে, মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়েও চলছে রাজনীতি? কোনো ধর্ষণকাণ্ড যদি আমাকে রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার রাস্তা করে দেয় তবেই সেই ধর্ষণ নিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। তাই আসামিকে নিয়ে মন্তব্য করলেও প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির ক্ষেত্রে আমরা সামান্য দুঃখপ্রকাশও করবো না? এ কেমন ধারা বিচার? লোকসভার স্পিকার থেকে শুরু করে আমাদের বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ কঠোর থেকে কঠোরতম নিন্দা করেন শুধু তাই নয়, কঠিন আইন এনে কঠোর হাতে এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করার কথা বলেন।

একজন নারী হিসেবে আমি গর্বিত তাদের জন্য। হবেও এবার সেরকমই কিছু। তেলেঙ্গনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বোঝা উচিত বিপদে পড়লে বাড়ির লোককেই আগে মনে পড়ে মানুষের। আর মেয়েটির জীবনসংশয় হতে চলেছে তা কি সেই মুহূর্তে বোঝা সম্ভব ছিল? কারুর পক্ষেই কি বোঝা সম্ভব? কাজেই নিজের প্রশাসনিক ত্রুটির কথা স্বীকার করে নেওয়াটাই ভালো নয় কি? প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমস্ত মহিলা সমাজের হয়ে আমার আবেদন তিন তালাক বিল এনে এবং তা কার্যকরী করে আপনি মুসলমান নিপীড়িত নারীদের লজ্জামুক্ত করেছেন। এবার আপামর সমস্ত ভারতীয় নারী আপনার শরণাপন্ন, আপনি কিছু করুন। আমরা জানি আপনিই পারেন একমাত্র ভোটবাক্সের কথা না ভেবে কিছু করতে। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভুলের প্রায়শ্চিত্য

শিব প্রকাশ

কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনকে স্বীকার করে যে ঐতিহাসিক ভুল করেছিল তার পরিণামে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করা পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে বসবাসরত কয়েক কোটি হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টানদের স্বার্থ রক্ষায়, তাদের সম্মানে নাগরিকত্বের দীর্ঘদিনের দাবি বিজেপি সরকার পূরণ করেছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পরে, ভারত এখন আইনত এই তিনটি দেশ থেকে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে আসা সংখ্যালঘুদের স্থায়ী বাসস্থান হবে। সরকারের এই পদক্ষেপ কোনও বিশেষ ধর্মের বিরোধিতা করার পদক্ষেপ হিসেবে না দেখে মূল ভারতীয় সমাজকে তার শিকড়ে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ হিসেবে দেখা উচিত।

এই পুরো বিষয়টিকে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য দেশপ্রেমিকরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজন হয় এবং পাকিস্তান নামে একটি নতুন দেশ গঠিত হয়। ধর্মের ভিত্তিতে এই বঙ্গপ্রদেশের একটি অংশও পাকিস্তানের অংশ হয়ে যায়, যা অবশেষে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বহু লোক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। তাঁরা বিভাজনের পরে সেখানেই রয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গপ্রদেশের এমনই এক মহান দেশপ্রেমিক ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চ্যাটার্জি। জন্মস্থানে থেকে যাওয়া কি তাঁর দোষ হিসেবে দেখা উচিত?

যে সমস্ত দেশভক্ত মাতৃস্বরূপা ভারতের সম্মানের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পিছপা হননি, তাদের মতন অসংখ্য মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার দায়িত্ব আজকের রাষ্ট্রভক্ত সমাজের ওপর। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বসবাসকারী সকল হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর মানুষকে সমন্বিত করার জন্য কাজ করেছে।

যে দলগুলি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করছে, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে ভোটের রাজনীতি করে আসছে। এই বিরোধিতার মূল ভিত্তি হলো তাদের রাজনৈতিক সুবিধা। সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে সরকারকে সংসদে ও বাইরে মুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার অধিকার অস্বীকার করার অভিযোগ এনেছে, যদিও এই বিলের মূল প্রস্তাবটিতে স্পষ্ট যে এই আইনের উদ্দেশ্য তিনটি দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশে ধর্মের ভিত্তিতে নির্যাতিত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টানদের ভারতের সম্মানজনক নাগরিকত্ব প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। এটি পুরোপুরি ভাবে স্পষ্ট যে নাগরিক সংশোধনী আইন ভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন করে না। এই আইনটি কোনওভাবেই তাদের নাগরিকত্বের ক্ষতি করবে না। যাইহোক, যে কোনও দেশের যে কোনও ব্যক্তি আইন অনুযায়ী নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারেন। এই বিধানটি ইতিমধ্যে দেশের আইনে উপস্থিত থাকলেও কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধী দলে নাগরিকত্ব আইনের নামে দেশের মুসলমানদের মধ্যে ভয় ও সংশয় সৃষ্টি করছে, তাদের পূর্ববর্তী অভ্যাসবশত।

যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার প্রথমবারের মতো ওই দেশগুলির ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য এ জাতীয় কাজ করেছে এমন নয়, এর আগে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের দাবিতে ১৩,০০০ শিখ ও হিন্দুকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও ২০০৩ সালে বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসা হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানকে সমর্থন করেছিলেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজও পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের হিন্দু, শিখ বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টানরা ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার হয়ে চলেছে। বিশেষত নারীদের প্রতি অবমাননাকর আচরণ, ধর্ষণ, জোর করে ধর্ম পরিবর্তনের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটেছে ও এখনও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। সুতরাং এত বছর ধরে নিপীড়িত হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া, তাদের সম্মান ও কর্তৃত্বের সঙ্গে জীবনযাপন করতে দেওয়া ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য হওয়া উচিত।

প্রতিবেশী দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের বর্তমান অবস্থা কী তা সকলেই জানেন। শুধু পাকিস্তানের পরিসংখ্যানেই দেখা যায় যে, সেখানে কীভাবে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার সময় সেখানে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ছিল ২৩ শতাংশেরও বেশি, আজ তাদের সংখ্যা আড়াই শতাংশেরও কম। স্বাধীনতার পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খানের মধ্যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারত এই চুক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েছিল, তবে পাকিস্তান যা করেছে বা আজও করে চলেছে তা সেখানকার পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ নং এর উদ্ধৃতি দিয়ে বিরোধী দলগুলি সরকারের জনগণের প্রতি ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করছে। এই দলগুলি আরও বলেছে যে নির্বাচনী রাজনীতির কথা মাথায় রেখে বিজেপি সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা এবং তিন তালাক বাতিল করার সময়ও একই অভিযোগ করা হয়েছিল, তবে এই দলগুলির ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে বিজেপি সর্বদা এগুলির বিরোধিতা করে এসেছে এবং আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে এটি কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভুল এবং যা সংশোধন করা প্রয়োজন।

(লেখক বিজেপির মহাসচিব যুগ্ম সংগঠন)

রায়গঞ্জে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ফিল্ড আউটরিচ ব্যুরোর উদ্যোগে 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' ভাবনাকে সামনে রেখে গত ২৮ ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরে সারাদিন ব্যাপী এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

করা হয়। ছোটোদের 'বসে আঁকো' এবং কলেজ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশিস বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। বক্তা হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক বাবুলাল বালা ও অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার লস্কর। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের আধিকারিক বিরাজ নারায়ণ রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সর্দার প্যাটেলকে স্মরণ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে আহ্বান করে বলেছেন সর্দার প্যাটেল ভূরাজনৈতিক ভাবে ভারতবর্ষের সংহতি স্থাপন করেছেন, দেশের ১৩০ কোটি দেশবাসীর কর্তব্য সেই ভারতকে সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ করা। প্রধানমন্ত্রীর সেই বার্তাকে সবার কাছে পৌঁছে দিতেই পিআইবি-র এই উদ্যোগ।' মঞ্চে উপস্থিত বক্তরাও তাঁদের বক্তব্যে ভারতের জাতীয় ঐক্যের কথাই তুলে ধরেন।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির ও সারদা শিশুতীর্থের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নৃত্য পরিবেশন করে। সংগীত পরিবেশন করে 'আনন্দধারা' এবং ভারত সরকারের সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের শিল্পীরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শান্তনু সেন। অনুষ্ঠানে শহরের বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় গোসেবা পুরস্কারে ভূষিত গোসেবা পরিবার

অখিল ভারতীয় গোসেবা পরিবার বেশ কয়েক দশক ধরে সারা ভারতে গোভিত্তিক গ্রামবিকাশের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে চলেছে। এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ গোসেবা পরিবারকে গত ৭ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের পুনাস্থিত গোবিজ্ঞান সংশোধন সংস্থা এবং দাদরা নগর হাভেলি মুক্তি সংগ্রাম সমিতির যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের হাত দিয়ে 'মোরপন্ত পিংলে গোসেবা পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়।

উল্লেখ্য, গোসেবা বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রশিক্ষণ বর্গ গত নভেম্বর মাসে ৪ স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ২০ জন মহিলা সহ ৪২ জন অংশগ্রহণ করেন। গোবর ও গোমূত্র দ্বারা সুপুষ্ট শস্য ও শাকসবজি উৎপাদন এবং মানব চিকিৎসায় ১০৮ রকমের রোগের প্রতিকার বিধি হাতে-কলমে শেখানো হয়। মেদিনীপুর জেলার কেশিয়ারীর কৃষক বিষ্ণুপদ সাউ তাঁর ১৫ কাঠা জমিতে গোবর-গোমূত্র সহযোগে কীভাবে মাত্র ৭০ টাকা ব্যয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করছেন তার বর্ণনা করেন। এলাকার ৪০ জন কৃষক কেবলমাত্র গোবর-গোমূত্রের প্রয়োগে চাষ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বজবজে স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

গত ২৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ শহরে পাবলিক লাইব্রেরির সভাগৃহে স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুভাষ সরকার। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার দীর্ঘদিনের পাঠক ডাঃ নিলয় মুখার্জি। স্বস্তিকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মঞ্চস্থ ব্যক্তিবর্গ। গৈরিক উত্তরীয় পরিয়ে তাঁদের বরণ করে নেন স্থানীয় পাঠকরা। নৃত্য সহযোগে গণেশ বন্দনা করে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন উপাসনা বাগ।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বস্তিকার পাঠক সজল মণ্ডল। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন স্বস্তিকা পত্রিকা সম্পর্কে মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশে পাঠক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনের সভাপতি ও প্রধান অতিথি দুজনেই স্বস্তিকার গ্রাহক বৃদ্ধির আবেদন জানান। উপস্থিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সহ সম্পাদক শ্রীমণ্ডল বলেন, ৭২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্বস্তিকা পত্রিকা মানুষের মনে দেশাত্মবোধ জাগরণের কাজ করে চলেছে। এই পত্রিকা নিউজ পেপার নয়, ভিউজ পেপার। দেশ-জাতি-সমাজ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা একমাত্র এই পত্রিকাই পাঠকদের সামনে তুলে ধরে চলেছে।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে নৃত্য সহযোগে ভারত বন্দনা পরিবেশন করেন উপাসনা বাগ। তারপরেই সভাগৃহে উপস্থিত সকলে প্রজ্বলিত দীপদণ্ড হাতে নিয়ে মঙ্গলাচরণ করে দেশ, জাতি ও সমাজ রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দিলীপ প্রামাণিক। শেষে লাল্টু সামন্তের সঙ্গে বন্দে মাতরম্ সংগীতে সবাই গলা মেলান। সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন এলাকায় স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি উৎপল আদক।

রায়গঞ্জে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

গত ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের উত্তর দিনাজপুর জেলার ৭ম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক উজ্জ্বল কুমার তালুকদার, রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক সহদেব সাহা, রাজ্য কমিটির সদস্য প্রদীপ বর্মন, তামস রঞ্জন ব্যানার্জি প্রমুখ। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিগণ। প্রদীপ প্রজ্বলন, ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও সরস্বতী বন্দনা করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তামস রঞ্জন ব্যানার্জি। সংগঠনের পরিচয়, উদ্দেশ্য, আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সহদেব সাহা। গুজরাটে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অধিবেশনের প্রস্তাব পাঠ করেন উজ্জ্বল কুমার তালুকদার। জেলার বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক উত্তম কুমার দাস।

দ্বিতীয় সত্রে শিক্ষক সমাজ ও স্বদেশপ্রেমের ওপর বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক বাবুলাল বালা। শিক্ষা, সংস্কার ও সমাজ চেতনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিদ্যভারতীর শিশুবাটিকা বিভাগের পঙ্কজ সরকার। কার্যকর্তা নির্মাণ ও কার্যকর্তাদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সহদেব সাহা। এর পরেই পনেরো জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। জেলা সভাপতি ও জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে পুলকপতি ত্রিবেদী ও উত্তম কুমার দাস। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষকদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের যুগ্ম আহ্বায়ক ড. অমর চন্দ্র কর্মকার। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর দিনাজপুর জেলা সঙ্ঘচালক অপূর্ব কুমার দাস। সম্মেলনে ১৩০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন সুচারু রূপে সঞ্চালন করেন জেলা সহ সম্পাদক প্রদীপ কুমার বিশ্বাস।

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পরিবার মিলন অনুষ্ঠান

গত ১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রাদেশিক কার্যালয় কেশব ভবনে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পরিবার মিলন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক সহ সভানেত্রী তথা কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্যা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তারপরই দক্ষিণেশ্বর শিশু-কিশোর মঞ্চের শিল্পীরা গৌড়ীয় নৃত্যের মাধ্যমে গণেশ বন্দনা করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীমতী রায়-সহ বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত ছিলেন সংগীত শিল্পী ড. স্বপন মুখার্জি, বাঁকুড়ার সাংসদ ডাঃ সুভাষ সরকার, রাষ্ট্রীয়

স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো, সহ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট এবং সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সংস্থাপক সদস্য সুভাষ ভট্টাচার্য ও প্রান্ত সভাপতি ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সোনারপুর শাখা সমবেত রবীন্দ্র সংগীত এবং শ্রীমতী গার্গী চক্রবর্তী ও সুবীর ভট্টাচার্য আবৃত্তি পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনাথের গান ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অবলম্বনে গীতিআলেখ্য পরিবেশন করে বাঁশদ্রোণী শাখা। বেহালা শাখা পরিবেশন করে সমবেত রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। গোবরডাঙ্গা শাখার শ্রীমতী সাধনা মজুমদার রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি করেন। বাগনান শাখার শিল্পীরা পরিবেশন করেন 'নমামি গঙ্গে' নৃত্যানুষ্ঠান। বারুইপুর শাখার শ্রীমতী লিপিকা চৌধুরী রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি করেন। হরিপুর শাখার শিশুশিল্পী অগ্নিদীপ্ত দে একটি অনবদ্য রাগপ্রধান সংগীত এবং চন্দ্রচূড় গোস্বামী একক গীত পরিবেশন করে। দক্ষিণ কলকাতা শাখা আগমনী গান এবং ঢাকুরিয়া শাখা আধুনিক গান পরিবেশন করে। দক্ষিণ হাওড়া শাখা মা দুর্গার বন্দনাগীতের ওপর নৃত্যানুষ্ঠান এবং কসবা শাখা মীরার ভজন পরিবেশন করে। দেশবন্ধুনগর শাখা সমবেত আবৃত্তি সহ সমবেত লোকসংগীত, উত্তর কলকাতা শাখা সংগীতালেখ্য, বাগুইআটি শাখা বৃন্দগান পরিবেশন করে। শেষে রামনামে আপ্লুত করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি করেন দক্ষিণেশ্বরের সংগীত শিল্পীরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রবীর ভট্টাচার্য। ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে রাষ্ট্রগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

গাজোলের হরিপুরে সারদা শিশুনিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ২৭ ডিসেম্বর মালদা জেলার গাজোল থানার হরিপুর শ্রীমতী দৈবকীদেবী সারদা শিশু নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় হরিপুর ক্রীড়াঙ্গনে। অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি রামপদ সরকার। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধি তথা মালদা সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্য পরেশচন্দ্র সরকার। বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্বলন, মাতৃবন্দনা ও শপথবাক্য পাঠের পর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। মরসুমের শীতলতম দিন হওয়া সত্ত্বেও ছোটোরা উৎসাহ সহকারে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। সম্মিলিত সূর্য নমস্কার ও ব্যায়ামযোগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি পরেশ চন্দ্র সরকার। পুরস্কার বিতরণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার।

হাওড়া বিবেক বিহারে রক্তদান শিবির

গত ২২ ডিসেম্বর হাওড়া শহরের ফজির বাজারে বিবেক বিহার ফেজ-২ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৯১ জন পুরুষ ও ২৭ জন মহিলা রক্ত দান করেন। কলকাতার আলিপুর স্থিত কমান্ড হাসপাতাল (আর্মি হসপিটাল) রক্ত সংগ্রহ করে। শিবিরে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী অরূপ রায়-সহ স্থানীয় বাসিন্দা মহেন্দ্র আগরওয়াল, অম্বুজ শর্মা, জয়ন্ত গুপ্তা, সমাজসেবী কমল বৈদ্য, জয়প্রকাশ গুপ্তা, মনোজ জয়সোয়াল, অনিল সিংহ। শিবির সঞ্চালনে সহযোগিতা করেন অজয় বৈদ্য, অনিল বৈদ্য, পদম জৈন, জ্ঞানেশ্বর সোমানী, পীযূষ আগরওয়াল, সুরেশ সোনী, বিনোদ খটোর প্রমুখ।

পরম্পরা

পৌষের বিদায়লগ্নে মানুষের ভাবসম্মিলন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

দীপ জ্বেলে যায়। পৌষের বিদায় ক্ষণটিকে বর্ণনা করা যায় এভাবেই। সাধারণ বিশেষ করে দেশের কৃষকসমাজকে নানা ভাবে আনন্দের উপকরণ জোগায় এই মাসটি। সারা দেশেই এই মাসটি হয়ে যায় আনন্দের মাস, সৌভাগ্যের মাস। আর তাই যাওয়ার বেলায়ও রাঙিয়ে দিয়ে যায় মানুষের মন। জ্বালিয়ে যায় আশার প্রদীপ। উদ্বুদ্ধ করে নতুন কাজে— নতুন উৎসাহে।

শুধু বঙ্গদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষেই পৌষান্তে মাঘের ঘরে পা দেওয়ার মুহূর্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় হিন্দু জনমনে মাঘের প্রথম ঊষা নিয়ে আসে মুক্তি আর আনন্দের বার্তা। তাই মানবজীবনে এই সময়টি বড়োই পুণ্যময়। সেই পুণ্য মুহূর্তে তাই মানুষ ছুটে যায় গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী-নর্মদার মতো পুণ্যতোয়ায় অবগাহন শেষে বিশেষ পূজা অর্চনা, শ্রাদ্ধ-তর্পণের মাধ্যমে অপার তৃপ্তি লাভের জন্য।

পৌষের বিদায় ক্ষণটি অন্ধকার থেকে আলোয় প্রবেশের মতোই মহা আনন্দে উদ্ভাসিত। সত্য-সুন্দর অনন্তের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হওয়ার, এক দিব্য আনন্দে ভেসে যাওয়ার বার্তাই দিয়ে যায় পৌষ সংক্রান্তির হিমেল রাত তার যাওয়ার বেলায়।

ঘরে ঘরে ওঠে তখন নতুন ফসল। আমন ধানে ভরে ওঠে গোলা। কয়েকমাসের অন্তহীন পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তার অবসানে কৃষকসমাজ প্রাপ্তির উজ্জ্বল স্পর্শে জেগে ওঠে নবআনন্দে। সেই আনন্দেরই প্রকাশ মকরসংক্রান্তির স্নান শেষে নতুন ধানের নবান্নে। পিঠে-পুলি-পায়েসের সুবাসে ভরে ওঠে চারিদিক। নতুন ধান-কোটা চলে আর নলেন গুড়ে তৈরি ওইসব উপকরণ নিবেদন করে সকলে গৃহদেবতা, বাস্তুদেবতা, গণদেবতার উদ্দেশে। তারপর সেইসব দিয়েই রসনাতৃপ্তি আর আনন্দ-প্রমোদে মেতে ওঠা। পূজা-উৎসব, ক্রীড়া ও নানা আমোদে সুস্থ জীবনের শক্তি সংগ্রহ আর নব উদ্দীপনায় ভবিষ্যৎ হয় পৌষমাসের ওই সন্ধিক্ষণে।

নানা কারণেই পৌষ সংক্রান্তি হিন্দুর জীবনের এক অতি স্মরণীয় পুণ্যক্ষণ। পুরাণ কথা, সংক্রান্তি হলেন দেবী মহামায়ারই এক শক্তির প্রকাশ। এই দিনেই বিনাশ করেছিলেন তিনি শঙ্করাসুর নামে এক দানবকে। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মকে। অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করে ফিরিয়ে এনেছিলেন শান্তি ও নীতিবোধকে। তাই পৌষসংক্রান্তিতে দেবীর আরাধনা হয়।

আবার এই পুণ্যমুহূর্তেই দক্ষিণায়নের পরিক্রমা সেরে রবির যাত্রা শুরু উত্তরায়ণের অয়ন রেখা ধরে। জ্যোতিষমতে রবি এই দিন পা রাখেন মকর রাশিতে। সূর্য বা রবির এই মকর রাশিতে প্রবেশের কারণেই পৌষমাসের

এই সন্ধিক্ষণটি চিহ্নিত মকর সংক্রান্তি নামে। এই দিন থেকেই শুধু রবির উত্তরার্ধের দিকে যাত্রা।

পুরাণের কথা, উত্তরায়ণের এই সূচনা থেকেই শুরু দেবতাদের দিনের। উত্তরায়ণ হলো দেবতাদের জেগে থাকার কাল। সে কারণেই এই সময় দেবীশক্তির জাগরণের জন্য প্রয়োজন পড়ে না কোনো বোধনের। সরাসরি করা যায় পূজা।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই উত্তরায়ণের দিন থেকে শুরু হয় প্রকৃত বড়ো দিনের। রাত্রির পরিমাণ কমে যায়। বেড়ে যায় দিনের সময় সূর্যের আলোতে আরও কিছু বেশিক্ষণ দৃশ্যমান থাকে এই চরাচর। প্রাকৃতিক অবস্থাই মানুষকে করে রাখে কর্মচঞ্চল।

মহাভারতে থেকে জানা যায়, অগ্রহায়ণের শেষে কুরুক্ষেত্র রণভূমে পিতামহ ভীষ্মের পতন হয় অর্জুনের শরাঘাতে। স্বেচ্ছায় মৃত্যুর বরপ্রাপ্ত ভীষ্ম দক্ষিণায়নের সময়কালে দেহত্যাগ করতে চাইলেন না। তাই শরশয্যায় শায়িত থেকে তিনি প্রতীক্ষা করতে থাকেন উত্তরায়ণের পুণ্যক্ষণের জন্য। পৌষ শেষ মাঘ মাসের সূচনাতেই উত্তরায়ণ কালে দেহত্যাগ করলেন ভীষ্ম। পতন হলো এক মহীরুহের, একইসঙ্গে এক পুণ্যমাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাঘের সূচনাকালটি। সেইসঙ্গে ঘোষিত হলো উত্তরায়ণের পুণ্যমাহাত্ম্যের কথা। সে কারণের পৌষ-সংক্রান্তির অবসানে মাঘের প্রথম শুভ যাত্রাক্ষণে পুণ্যস্নান করে মানুষ কুড়িয়ে নেয় তার শেষ জীবনের পারানি পরম বিশ্বাসে।

রবির মকর রাশিতে সঞ্চার, উত্তরায়ণ থেকে দেবতাদের জাগরণ, পুণ্যাত্মা ভীষ্মের দেহাবসান ইত্যাদি নানা পুণ্য মুহূর্তের সমাচার হলো পৌষ-সংক্রান্তি তথা মাঘের প্রথম দিনটি।

দিনটি বিশেষ বার্তাবহ হয়ে রয়েছে আরও একটি বিশেষ কারণেও। এই দিনই পতিতপাবনি গঙ্গার পুণ্যবারি স্পর্শে প্রাণ ফিরে পান রাজা সগরের ষাট হাজার সন্তান।

পুরাণ কথা অনুসারে, রাজা সাগর করেছিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন। তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির আতঙ্কে দেবরাজ ইন্দ্র হরণ করেন যজ্ঞাশ্বটি। রেখে আসেন সেটি পাতালে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে। রাজা সগরের ষাট হাজার সন্তান খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে অশ্বটি দেখতে পায় কপিল মুনির আশ্রমে। মদমত্ত রাজপুত্ররা কোনোকিছু বিচার না করেই অশ্ব অপহারক ভেবে মুনির ধ্যান ভাঙায়। ধ্যান ভাঙানোয় ক্রুদ্ধ হন কপিল মুনি। তাকান তিনি রোষ কষায়িত নেত্রে। সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যায় সগরের ষাট হাজার সন্তান।

সময় বয়ে যায়। আসে না ছেলেরা যজ্ঞাশ্ব নিয়ে। উদ্বিগ্ন রাজা সগর এবার নাতি অংশুমানকে পাঠান সকলের খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে কপিলমুনির আশ্রমে আসে অংশুমান। দেখতে পায় যজ্ঞাশ্ব এবং ধ্যানমগ্ন কপিল মুনিকে। নানা স্তবস্তুতিতে ধ্যান ভাঙান তিনি মুনির। জানতে পারেন তাঁর পিতৃপুরুষদের পরিণামের কথা।

অংশুমানের স্তুতি ও কান্নায় বিগলিত কপিল বলেন, স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনতে পারলে সেই পুণ্যবারির স্পর্শেই জীবন ফিরে পাবেন সগর-পুত্ররা। মুনিকে প্রণাম করে ফিরে আসে অংশুমান। রাজা সগর শেষ করেন যজ্ঞ। অংশুমান শুরু করেন তপস্যা মর্ত্যে গঙ্গাদেবীকে অবতরণের জন্য।

সফল হলেন না তিনি। ব্যর্থ হলেন তাঁর ছেলে দিলীপও। অবশেষে দিলীপের ছেলে ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গা নেমে এলেন মর্ত্যে। পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গা এসে মিলিত হলেন সাগরে কপিলমুনির আশ্রমের কাছে। গঙ্গাধারায় শাপমুক্ত হলেন সগরপুত্ররা। তারপর থেকেই সাগরসঙ্গমে পৌষসংক্রান্তির স্নান ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে হয়ে দাঁড়াল এক পুণ্য অনুষ্ঠান। আজও গঙ্গাসাগরে এসে সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে স্নান করেন। পুজো দেন কপিল মুনির মন্দিরে। আর ওই উপলক্ষে সাগরদ্বীপে বসে এক বিরাট মেলা।

পৌষ তথা মকর সংক্রান্তির দিনটি পালিত হয় সারা ভারতবর্ষেই। বঙ্গদেশে এই দিনটি হলো পিঠেপুলির উৎসব পৌষ পার্বণ। বাড়িতে বাড়িতে পালিত হয় দিনটি গৃহদেবতার নবান্ন উৎসব বাস্তুপূজার দিন হিসেবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেও বহু বাড়িতে দিনটি পালিত হয় একই ভাবে। পৌষ সংক্রান্তির দিন বিশেষ করে গ্রামবাঙ্গলায় হয় লক্ষ্মীর পূজা। কোথাও কোথাও এই পূজা হয় পয়লা মাঘে। পূজায় অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে দেওয়া হয় নতুন ধানের চালের গুড়ো ও নলেন গুড়, পাটালি দিয়ে তৈরি নানারকম পিঠে পায়েস।

সংক্রান্তির দিন অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে তিল দান করা হয় বলে এই সংক্রান্তি তিল সংক্রান্তি নামেও পরিচিত।

হিন্দুর প্রায় সমস্ত পূজা অনুষ্ঠানই হয় চান্দ্রমাসের গণনা অনুযায়ী। সে কারণেই তিথি ভিত্তিক এইসব উৎসবের ঠিক নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। এক্ষেত্রে অল্প যে কটি ব্যতিক্রম রয়েছে তার একটি এই মকর সংক্রান্তি। এটি সৌরবৎসয়ের গণনা অনুযায়ী পালিত হয়। তাই দিনটি মোটামুটি প্রতি বছরই পড়ে ইংরাজির ১৪ জানুয়ারি। একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে দিনটি পড়ে ১৫ জানুয়ারি। মকর সংক্রান্তি রবির মকর রাশিতে সঞ্চারণ উপলক্ষে সৌরবর্ষ গণনা রীতিতে পালিত হওয়ার কারণে এটি একটি সৌর অনুষ্ঠানও বটে। এদিনটি সূর্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। পূজাও করা হয় সূর্যদেবতার। প্রতি বারো বছর অন্তর মকর সংক্রান্তির দিনটি বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে পালিত হয়। বসে মহাকুম্ভের মেলা। ওইদিন প্রায় ৪০ লক্ষ পুণ্যার্থী কুম্ভমেলায় স্নান করেন। এটি বিশ্বের বৃহত্তম মেলা হিসেবে পরিচিত। বলা হয় আদি শঙ্করাচার্য এই কুম্ভমেলার প্রচলন করেন।

মকর সংক্রান্তি পালিত হয় সারা ভারতবর্ষেই। পঞ্জাব ও উত্তর ভারতের কিছু জায়গায় এই দিনের উৎসবের নাম মাঘী, তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, অন্ধ্রপ্রদেশে পেডা পাণ্ডুগা, মহারাষ্ট্র কর্ণাটকে মকর সংক্রান্তি, অসমে মাঘ-বিহু, গুজরাটে উত্তরায়ণ, উত্তরপ্রদেশে ও পশ্চিম বিহারে খিচড়ি, মিথিলায় তিল সাকরাইত নামে পরিচিত। এছাড়া নেপালে এর নাম মাঘে সংক্রান্তি বা মাঘী খিচড়ি সংক্রান্তি, বাংলাদেশে শকরাইন বা পৌষ সংক্রান্তি মালয়শিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় থাই পোঙ্গল নামে পরিচিত।

মকর সংক্রান্তি যেমন সূর্য পূজার দিন, একই ভাবে একটি কৃষি নির্ভর ভারতে নতুন শস্য ওঠার উৎসবেরও দিন। সে কারণেই পূজা-অর্চনার সঙ্গে সঙ্গে এদিন বিভিন্ন জায়গায় মানুষ মেতে ওঠে নানা উৎসবে। গুজরাটে যেমন দিনটি পালিত হয় ঘুড়ি ওড়ানো ও ঘুড়ির প্রতিযোগিতার দিন হিসেবেও।

সব মিলিয়ে বলা যায় পৌষ-সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি হলো ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত একটি বিশেষ লোকোৎসব। সর্বশ্রেণীর মানুষই যোগ দেয় এই উৎসবে। পূজা- পাঠ এর একটি অঙ্গ। কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ এবং লোকজীবনের বৈশিষ্ট্যই অনন্য করে তুলেছে এই বিশেষ মকর-সংক্রান্তি উৎসবকে। ■

১৪২৬ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা

অরিজিৎ রায়চৌধুরী

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা মতে ১৪ মাঘ, ইংরেজি ২৯ জানুয়ারি ২০২০, বুধবার সূর্যোদয় ঘ ৬।২২।৪৮ সে:। চতুর্থী ঘ ৮।৪৪।৫৮ সে: পর্যন্ত এবং পূর্ব্বাহ্ন ঘ ১০।০।৩৪ সে:। ১৫ মাঘ ইংরেজি ৩০ জানুয়ারি ২০২০, বৃহস্পতিবার সূর্যোদয় ঘ ৬।২২।২৬ সে:। পঞ্চমী ঘ ১০।৫৪।৫২ সে: পর্যন্ত এবং পূর্ব্বাহ্ন ঘ ১০।৫৪।৫২ সে:।

অর্থাৎ দুইদিনেই পূর্ব্বাহ্ন মুহূর্তের অন্যূনকাল লাভ করেছে। —এ বিষয়ে ''সা চ চতুর্থীযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ''— যুগ্মশাস্ত্র এবং ''পঞ্চমী চ প্রকর্ত্তব্যা চতুর্থী সহিতা বিভো''— স্কন্দপুরাণ। —সুতরাং যুগ্মশাস্ত্র ও স্কন্দপুরাণের বচন অনুসারে পঞ্চমী চতুর্থীযুক্ত গ্রহণ করবে অর্থাৎ চতুর্থীযুক্ত পঞ্চমী খণ্ডেই শ্রীপঞ্চমীর পূজা কর্তব্য। পরদিন উদয়কালের পঞ্চমীতিথিতে পূজা হবে না। অর্থাৎ ১৪ মাঘ, ইংরেজি ২৯ জানুয়ারি ২০২০ বুধবার ঘ ৮।৪৪।৫৮ সে: থেকে শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা হবে।

ছাড়া ''তৎ শুক্লাপরং শুক্লপক্ষে তিথিগ্রাহ্যেত্যেক বাক্যত্বাদিতি কেচিত্তচ্চিন্ত্যং। চতুর্থী সংযুক্ত কার্য্যা পঞ্চমী পরয়া ন তু। দৈবে কর্ম্মণি পৈত্রে চ শুক্লপক্ষে তথাসিতে।''— ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্তীয় বচন অনুসারে ''শুক্লপক্ষে তিথির্গ্রাহ্যা...'' —এই বচনের সঙ্গে একবাক্যতা করে শুক্লপক্ষের এইরূপ কেউ বলেছিলেন— তাহা গ্রাহ্য নয়। কারণ শুক্লপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষে দৈবকর্ম ও পিতৃকার্যে পঞ্চমীতিথি চতুর্থী যুক্ত গ্রহণ করবে, কখনোই ষষ্ঠীযুক্ত পঞ্চমী গ্রহণ করতে নেই— এটাই কালমাধবীয়ধৃত হারীত বচন এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যেরও এই একই মত।

পুনরায় সংবৎসর প্রদীপ ধৃতম্—

''পঞ্চম্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীং পুষ্পধূপান্নাবারিভিঃ।
মস্যাধারং লেখনীঞ্চ পূজয়েন্ন লিখেত্ততঃ।।
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।
তস্যা পূর্ব্বাহ্ন এবেহ কার্য্যঃ সারস্বতোৎসবঃ।।''

অর্থাৎ সংবৎসর প্রদীপধৃত বচন অনুসারে— মাঘমাসের শুক্লপঞ্চমীতিথির পূর্ব্বাহ্নে পুষ্প-ধূপ-অন্ন ও জলদ্বারা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী, মস্যাধার (দোয়াত) ও লেখনীর (কলম) পূজা করবে।

''অস্যা দিনদ্বয়েঽপি পূর্ব্বাহ্ন ব্যাপিত্বে পূর্ব্বদিনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা কর্ত্তব্য।'' অর্থাৎ এই পঞ্চমীতিথি দু'দিন পূর্বাহ্ন মুহূর্তের অন্যূনকাল পেলে পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ চতুর্থীযুক্ত পঞ্চমীখণ্ডে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা হবে, পরদিনে উদয়কালে পঞ্চমীতিথি থাকলেও পূজা হবে না।

সুতরাং ১৪২৬ সনে ১৪ মাঘ, ইংরেজি ২৯ জানুয়ারি ২০২০, বুধবারে ঘ ৮।৪৪।৫৮ সে: থেকে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা হবে। যা গুপ্তপ্রেসে পঞ্জিকায় লিখিত হয়েছে। —এটাই শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা।

(লেখক গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার বর্তমান কর্ণধার)

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আমতলা মহকুমার পূর্বতন মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ, বর্তমানে স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধি উৎপল আদকের মাতৃদেবী অসীমাবালা আদক গত ২৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৪ পুত্র, পুত্রবধূ, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা নগরের স্বয়ংসেবক তথা এবিভিপি-র নগর সভাপতি তাপস বাজপেয়ীর মা সাধনা বাজপেয়ী গত ১০ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল৭৯ বছর।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

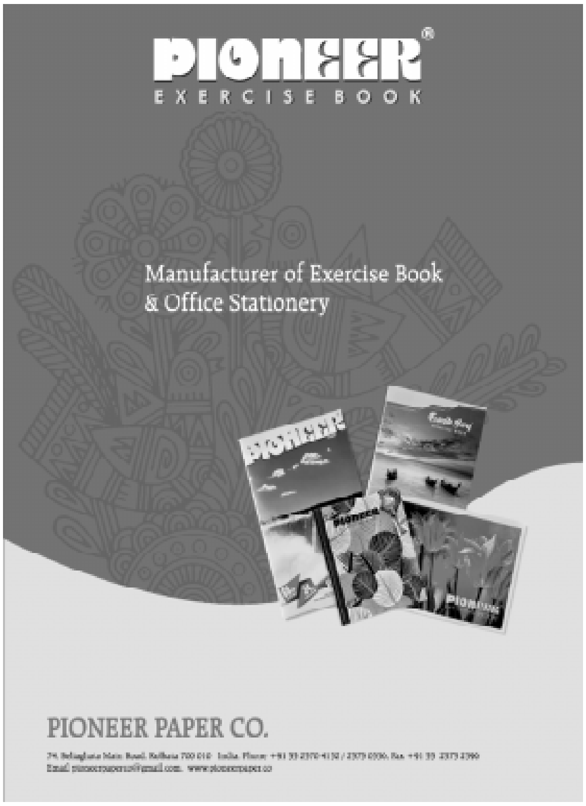

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

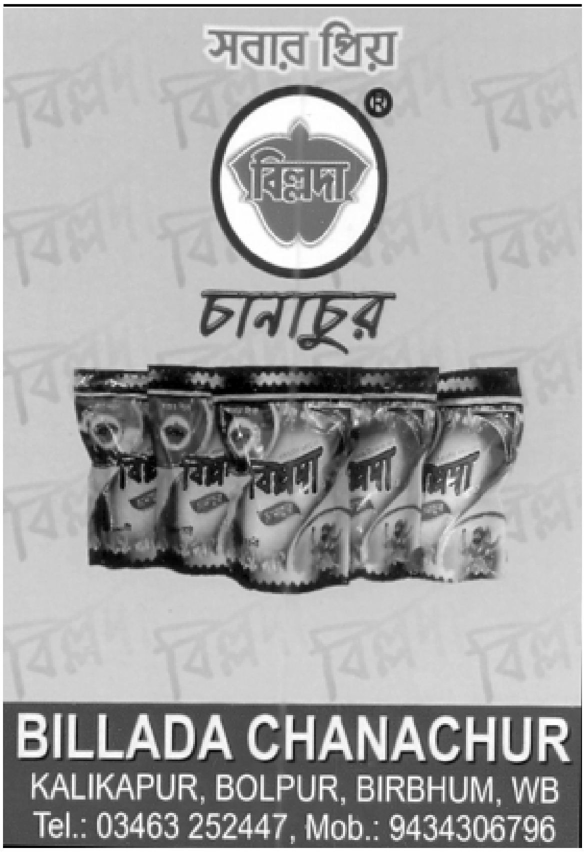

পথের পাঁচালীর চারটি চরিত্র

রূপশ্রী দত্ত

সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী (১৯৫৫) বাংলা চলচ্চিত্র জগতে একটি আলোকস্তম্ভ। এই ছবিতে অপুর মা সর্বজয়া চরিত্রে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়। প্রথম অভিনয়েই তিনি দর্শকদের মনোজগতে স্থান করে নিয়েছিলেন। আজকের দর্শকরাও পথের পাঁচালির সর্বজয়াকে সশ্রদ্ধচিত্তে মনে রেখেছেন। অপু- ট্রিলজির দ্বিতীয় পর্ব 'অপরাজিত'তেও তিনি ছিলেন।

পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' (১৯৬০), 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২) এবং অন্যান্য কিছু ছবিতেও তাঁকে দেখা গেছে। 'হেডমাস্টার', 'শুভবিবাহ', 'কত অজানারে' ও 'ইন্টারভিউ' এরকম কয়েকটি ছবি।

তিনি যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। 'অপরাজিত'র জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

২৫ ডিসেম্বর, ১৯১৯ সালে, তিনি কলকাতায় জন্মেছেন। ১৩ নভেম্বর, ২০০১ সালে ৮১ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ এ বছরেই।

দ্বিতীয় চরিত্র হলেন চুনিবালা দেবী। তিনি দর্শকচিত্তে অমর হয়ে আছেন পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুণ চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। তাঁর দন্তবিহীন সর্বংসহা মুখমণ্ডল, ভাইয়ের সংসারের সদস্যদের প্রতি অপার স্নেহশীলতা, ভ্রাতৃজায়ার বিরূপতাকে সহনশীলতার সঙ্গে মেনে নেওয়া, অশীতিপর বৃদ্ধা হয়েও অপু-দুর্গার মতো বালক- বালিকার সঙ্গিনী হওয়া— উপন্যাসে উপস্থাপিত পুরো চিত্রকেই তিনি ছবির পর্দায় নিয়ে এসেছেন। আকৃতি প্রকৃতিতে তিনি এতটাই বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছিলেন যে, বয়োবৃদ্ধা এক অভিনয়শিল্পীর ক্ষেত্রে তা অকল্পনীয়। তিনি ১৮৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯৫৫ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি 'বিগ্রহ' (১৯৩০), 'রিক্তা' (১৯৩৯) নামে আরও দুটি ছবি করেছিলেন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ম্যানিলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তিনি ইন্দির ঠাকরুণের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। ১৯৫৫ সালে অসুস্থ চুনিবালাকে পথের পাঁচালী মুক্তির কিছু আগে সত্যজিৎ ছবিটি দেখিয়ে আসেন। তার অনতিকাল পরেই চুনিবালা মারা যান।

তৃতীয় চরিত্র কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (২০ জুন ১৯০৫— ২৭ জানুয়ারি ১৯৮৩)। তিনি চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা এবং পরিচালক ছিলেন। পথের পাঁচালী ছবিতে অপুর পিতা হরিহরের ভূমিকায় তিনি অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন। অপু ট্রিলজির অপরাজিততেও (১৯৫৬) তিনি একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তিনি রাজস্থানের যোধপুরে জন্মেছেন। প্রথমে অপেশাদার শিল্পী হিসেবে শিশির কুমার ভাদুড়ির সঙ্গে 'বিরাজ বৌ' (১৯৩৪) ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯৫৫ সালে 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'তে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'হরিহরের পাঁচালি' নামে তাঁর সম্পর্কিত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয়া বারোমাস পত্রিকায় ১৯৭৯ সালে। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবির মধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৯২৭), 'দেশের মাটি' (১৯৩৮), চাণক্য (১৯৩৯), 'শাপমুক্তি', (১৯৪০), 'আলো আমার আলো' (১৯৭১), 'সাহেব বিবি গোলাম' (১৯৫৫) উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ চরিত্র পথের পাঁচালীর অপুর ভূমিকাভিনেতা সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় তাঁর সাত বছর বয়স। সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালী নির্মাণের প্রাক্কালে অপুর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য পাঁচ থেকে সাত বছরের বালকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বেশ কয়েকজনই 'অডিশন'-এর জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল। কিন্তু কেউই পরিচালকের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। অবশেষে, সত্যজিৎ-পত্নী বিজয়া রায় একদিন পাশের বাড়ির ছাদে একটি ছেলেকে খেলা করতে দেখে সত্যজিৎকে জানালেন এবং সেই ছেলেটিই এই ভূমিকার জন্য মনোনীত হলো। সেই ছেলেটিই অপুর ভূমিকায় বিখ্যাত শিশু অভিনেতা সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবীরের বাবা প্রথমে

অভিনয়ের ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু সত্যজিৎ তাঁকে বললেন— 'আজ কেউ আপনার ছেলেকে চেনে না। কিন্তু একদিন সারা বাঙ্গলাই ওর আর আমার— আমাদের দু'জনের নাম জানবে।' তখন তাঁর বাবা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। ১৯৫২-৫৪ পর্যন্ত পথের পাঁচালীর শ্যুটিং চলেছিল। মাঝখানে এক বছরের ব্যবধান ছিল। কাশবনে অপু-দুর্গার দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ট্রেন দেখা— এইসব দৃশ্যগুলি অনন্য। তারপর সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় চলচ্চিত্রের পরিমণ্ডল থেকে দূরে সরে যান।

পরবর্তীকালে (২০১৩) 'অপুর পাঁচালি' চিত্রায়িত হয় সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকে ভিত্তি করে। এই ছবির পরিচালনার জন্য কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পুরস্কার পান ৪৪তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। পরিচালক একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের অপুর সঙ্গে ভূমিকাভিনেতা সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের বেশ কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

এইভাবেই পথের পাঁচালীর অন্তর্গত চারটি চরিত্রের ভূমিকাভিনেতা, অভিনেত্রীরা 'পথের পাঁচালী'কেই তাঁদের অভিনয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে অন্যত্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছিলেন। ■

নন্দীবিলাসের বুদ্ধি

বহু বছর আগে ভগবান বোধিসত্ত্ব একবার ষাঁড় রূপে জন্ম নেন। সেসময় তার নাম ছিল নন্দীবিলাস। সে একটু বড়ো হতেই তার মালিক তাকে এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ নন্দীবিলাসকে খুব যত্ন করতেন। সন্তানের মতোই তাকে প্রতিপালন করতেন। এক সময় নন্দীবিলাস পূর্ণবয়স্ক হয়ে যায়। খুব কষ্টে ব্রাহ্মণের সংসার চললেও নন্দীবিলাসকে সুখে রাখে। নন্দীবিলাসও মনে মনে ভাবে কীভাবে তার মালিককে সুখে রাখবে।

নন্দীবিলাস অনুভব করল যে, সে জম্বুদ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ষাঁড়। এই শক্তি দিয়েই সে তার মালিকের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। তাই একদিন সে তার মালিককে ডেকে বলল, প্রভু, এই দেশে কোন বণিকের অনেক বেশি গোধন আছে আমায় বলুন। ব্রাহ্মণ অনেক চিন্তা করে একজন বণিকের নাম বললেন। নন্দীবিলাস বলল আপনি তার সঙ্গে বাজি ধরে বলুন যে, আপনার ষাঁড় একাই একশোটি মাল বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে পারে। হেরে গেলে তাকে এক হাজার মুদ্রা দেবেন। আর জিতে গেলে ওই বণিক এক হাজার মুদ্রা দেবে। ব্রাহ্মণ নন্দীবিলাসের কথায় খুশি হয়ে সেই বণিকের কাছে গিয়ে বাজি ধরলেন। বণিক তাচ্ছিল্য ভরে হেসে বলল আপনার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন আমিও স্বীকার করলাম।

নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ নন্দীবিলাসকে নিয়ে এলেন। বণিক ইট পাথর বোঝাই একশোটি গাড়ি সাজিয়ে রেখেছে।

ব্রাহ্মণ একটি গাড়িতে নন্দীবিলাসকে জুড়ে দিলেন। তারপর গাড়িতে উঠে নন্দীবিলাসের পিঠে চাপড় মেরে বললেন, চল শয়তান ঝড়ের বেগে গাড়িগুলি একে একে নিয়ে চল। কিন্তু কী আশ্চর্য। নন্দীবিলাস এক পা-ও নড়ল না। ব্রাহ্মণ হতবাক হয়ে গেলেন। অপমানে লাল হয়ে গেলেন। বাধ্য হয়ে বণিককে এক হাজার মুদ্রা গচ্ছা দিয়ে নন্দীবিলাসকে গালমন্দ করতে করতে বাড়ি ফিরে এলেন।

বাড়ি এসে আবার এক প্রস্থ গাল পাড়লেন। তখন নন্দীবিলাস বলল, আপনি আমাকে শয়তান বললেন তাই আমি রেগে গিয়ে শক্তি প্রয়োগ করিনি। আর সেজন্যই আপনি হেরে গেলেন। ব্রাহ্মণ নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করতে লাগলেন। তখন নন্দীবিলাস বলল প্রভু, আবার ওই বণিকের সঙ্গে বাজি ধরুন। আর এবার চার হাজার মুদ্রা। ব্রাহ্মণ বণিকের কাছে নতুন প্রস্তাবের কথা বলল। বণিকের আগেরবার জিতে গিয়ে লোভ হয়েছিল। তাই সে চার হাজার মুদ্রার লোভে রাজি হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ আবার নির্দিষ্ট দিনে নন্দীবিলাসকে নিয়ে হাজির হলেন। বণিক আরও ভারী ভারী পাথরে বোঝাই করে একশোটি গাড়ি প্রস্তুত রেখেছে। ব্রাহ্মণ একটি গাড়িতে নন্দীবিলাসকে জুড়ে দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, চল বাবা, সোনা মানিক আমার। নন্দীবিলাস নিমেষের মধ্যে গাড়িটি টেনে নিয়ে গেল। একে একে সবকটি গাড়ি নির্দিষ্ট স্থানে টেনে নিয়ে গেল। নন্দীবিলাসের শক্তি দেখে বণিক ও উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেল। বাজি হেরে গিয়ে বণিক ব্রাহ্মণকে চার হাজার মুদ্রা দিল। নন্দীবিলাসের কেরামতি দেখে অন্য লোকেরাও নানা জিনিস উপহার দিল। এর পর থেকে ব্রাহ্মণ নন্দীবিলাসকে নিজের সন্তানের মতো মনে করতে লাগলেন।

সৌম্যজিৎ দাস

ভারতের পথে পথে

চম্পাবত

লোহাঘাট থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ১৬১৫ মিটার উঁচুতে অতীতের চাঁদ রাজাদের রাজধানী চম্পাবত। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে রোহিলা সর্দার আলি মহম্মদ ধ্বংস করে ফেলে চাঁদ রাজাদের অতীত। রাজাদের পাহাড়ি দুর্গে এখন তহসিল অফিস হয়েছে। দুর্গ লাগায়া চম্পাবতের অন্যতম নাগনাথ মন্দির। কুমায়ুনি শৈলীতে স্লেটপাথরে নির্মিত প্যাগডাধর্মী মন্দিরের বিগ্রহ মহাদেব নাগনাথ। পিছনে লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির। দুর্গের সামনের পথে রাজা বুন্দা কি কিলার ধ্বংসাবশেষ। একটু দূরে বালেশ্বর মহদেব মন্দির ছড়াও বেশ কয়কটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে।। সবগুলিরই জীর্ণ দশা। বাদামি রঙের বেলে পাথরের কারুকার্যময় মন্দিরে কুমায়ুনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চম্পাদেবী ও দেবতা শিবঠাকুর বিরাজমান। জনশ্রুতি, কৈলাস ও মানসসরোবরের পথে পঞ্চপাণ্ডবরা আসেন চম্পাবতে। এখানকার দেবতা শিবঠাকুরের প্রতিষ্ঠা পাণ্ডবদের হাতে। বাণেশ্বর শিবের নাম এখন হয়েছে মানেশ্বর। একই চত্বরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতামাতার মন্দির তৈরি হয়েছে।

জানো কি?

- ২০২০-তে ৩২ তম অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে টোকিয়োতে। • ২০২৪-এ ৩৩ তম অলিম্পিক গেমস হবে প্যারিসে।
- ২০২০-র অলিম্পিক গেমসের অ্যাম্বাসাডর মেরিকম।
- মেরিকমের আত্মজীবনীর নাম 'আনব্রেকেবল'।
- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের লৌ জানে।
- ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামের বর্তমান নাম অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম।

ভালো কথা

মা

এই ভালো কথাটি অমেরিকার। নিউজার্সির বাসিন্দা সিয়েরা স্ট্যাংফিল্ডের সন্তান এক বিরল রোগে জন্মের পরই প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে রয়েছে মাতৃদুগ্ধের অফুরন্ত ভাণ্ডার। নিজের সন্তান বাঁচেনি, কিন্তু অন্যের সন্তানকে বাঁচাতে চান। স্তনদানের সুখ নিতে চান অন্য উপায়ে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের বুকের দুধ সংরক্ষণ করার। একটানা ৬৩ দিন ধরে নিজের স্তন্য সংরক্ষণ করে, প্যাকেট বন্দি করে তুলে দিলেন মিল্ক ব্যাঙ্কের কর্মকর্তার হাতে। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা নিজের ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা ভাইরাল হয়ে যায়। এব্যাপারে সিয়েরার স্বামীও তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, সন্তান হারানোর সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন 'আমি স্তন্য দান করব। আমার বুকের দুধে অন্য শিশুরা বেঁচে থাকুক।' ধন্য সিয়েরা! তিনি মাতৃজাতির কাছে আদর্শ হয়ে রইলেন।

বৈশালী গোস্বামী, দ্বাদশ শ্রেণী, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়া দিল্লি,

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) তি ষা মা পা প্র

(২) ণ হি পু কা রা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) রি হা দু জা য়া র

(২) ং মা কা লি স হ

৩০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) আলোকরশ্মি (২) আলুবোখরা

৩০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অনুপ্রবেশকারী (২) অনুধাবনযোগ্যে

উত্তরদাতার নাম

(১) আকাশ বাসফোর, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (২) সৈকত সরকার, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯। (৪) অর্ঘকমল সাই, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২০।।

বিশেষ প্রতিবেদন

রাজাকার তালিকা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার প্রয়াস

শিতাংশু গুহ

বাংলাদেশে একাত্তরে হিন্দু রাজাকার ছিল এটি বিকৃত ও মিথ্যা তথ্য। একটি সরকার যখন একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে 'টার্গেট' করে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন ওই গোষ্ঠীর কারো পক্ষে সম্ভব নয় সেই খুনি সরকারের সঙ্গে হাত মেলানো। একাত্তরে পাকিস্তানি সেনার টার্গেট ছিল হিন্দুরা। তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানকে হিন্দু-শূন্য করার জন্যেই তাঁরা গণহত্যায় নেমেছিল। প্রথম দিন ২৫ মার্চ থেকে বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে সেই কাজটি সুচারুভাবে করেছে। 'লুঙ্গি খুলে' যাদের ধর্ম পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তাদের পক্ষে কী রাজাকার হওয়া সম্ভব ছিল? সিনেটর টেড কেনেডির রিপোর্ট অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের ৮০ শতাংশ ছিল হিন্দু। নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী হিন্দু বাড়ি 'এইচ' লিখে চিহ্নিত করা হতো। এই অবস্থায় হিন্দুদের পক্ষে পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'রাজাকার' হওয়া সম্ভব ছিল না। সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে তাই স্বাধীনতার প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পর হিন্দু রাজাকার সৃষ্টি করা হয়েছে। রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার হয়ে গেছে। সেদিক থেকে হিন্দুদের রাজাকার বানানো তেমন কঠিন কিছু নয়। বাংলাদেশে সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল করতে 'সাম্প্রদায়িক রাজাকারদের তালিকায়' কিছু হিন্দু নাম ঢুকিয়ে সেটি অসাম্প্রদায়িক করা হয়েছে মাত্র। সংক্ষেপে এটিকে 'রাজাকারের অসম্প্রদায়ীকরণ' বলা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো, হিন্দুদের রাজাকার তালিকাভুক্ত করার সাহস তারা পেল কীভাবে? পুরো রাজাকার তালিকা দেখিনি, তবে তালিকায় নাকি জামাত ৩৮ জন, হিন্দু ৯২ জন। পরিসংখ্যান বলছে, হিন্দুরা পাকিস্তানকে বড্ড ভালোবাসতো। বঙ্গবন্ধু আমলে যাঁরা 'শত্রু সম্পত্তি' আইনকে 'অর্পিত সম্পত্তি' করেছিল, তাদেরই উত্তরসূরীরা শেখ হাসিনার আমলে হিন্দুদের 'রাজাকার' বানিয়েছে। মন্ত্রী অনেক আবোল-তাবোল বলেছেন। তাতে কিন্তু নাম ঢোকানো বা বাদ দেওয়ার সমস্যা হবার কথা নয়। তাই বরিশালের মুক্তিযোদ্ধা তপন চক্রবর্তী রাজাকারের তালিকায় ঢুকে পড়েছেন, অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত রাজাকারদের নাম বাদ পড়ে গেছে এবং হিন্দুদের নাম ঢুকে গেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কতটা অদক্ষ ও অযোগ্য এই তথ্য তা প্রমাণে যথেষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের পর শেখ ফজলুল হক মনি বলেছিলেন, 'মোনায়েম খানের প্রশাসন দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার চলতে পারে না।' 'মুখে শেখ ফরিদ, বগলে ইট' প্রশাসন দিয়ে শেখ হাসিনার সরকার

তবে এটি স্পষ্ট, হিন্দুদের রাজাকার তালিকাভুক্তি একটি নতুন ষড়যন্ত্র, চরিত্র হননের খেলা। গ্যারি ব্যাস তাঁর 'টি ব্লাড টেলিগ্রাম : নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড এ ফরগটেন জেনোসাইড' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই প্রায় এক লক্ষ হিন্দু নিহত হয়'। পঁচিশে মার্চ ১৯৭১ রাতে রাজারবাগ পুলিশ ফাঁড়ির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু

(ফাইল চিত্র)

ক্যামনে চলছে কে জানে? রাজাকার তালিকা স্থগিত হয়েছে। এনিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যেকার বিতণ্ডা থেমেছে। শাহরিয়ার কবীর বলেছেন, তাঁরা ত্রিশ হাজার গেজেটেড রাজাকারের নাম প্রকাশ করবেন। রাশেদ খান মেনন বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধা তালিকা প্রণয়নে যে কেলেঙ্কারি হয়েছে, রাজাকার তালিকা দণ্ডপ্রাপ্ত রাজাকারদে নাম নেই, এর সুদূরপ্রসারী একটি তাৎপর্য আছে। মন্ত্রী যতই বলুন না কেন, এর পেছনে চক্রান্ত আছে! এই তালিকা নিয়ে ভবিষ্যতে অনেকে 'সাধু' হয়ে যাবেন, অনেকের সম্মান ভুলুণ্ঠিত হবে! মন্ত্রী হয়তো তখন থাকবেন না, কিন্তু তার অপকর্মটি থেকে যাবে!

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী সম্পর্কে আমার তেমন কিছু বলার নেই। কদিন আগে তিনি একজন হিন্দুকে মুসলমান বানানোর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে 'শোকরানা আদায় করেছেন। রাজাকার তালিকায় খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ আছে কিনা জানতে পারিনি। সময়ের সঙ্গে দেশ একদিন মুক্তিযোদ্ধা শূন্য হবে, কিন্তু কখনো রাজাকার শূন্য হবে না।

অধ্যুষিত শাঁখারি বাজার, জগন্নাথ হল আক্রান্ত হয়েছিল, তারপর রমনা কালীবাড়ি, এটাই টার্গেট কিলিং। আওয়ামি লিগ নেতাকর্মীরাও টার্গেট ছিলেন, সেটা ধর্মীয় কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণে।

প্রকাশিত রাজাকার তালিকায় রাজাকারের সংখ্যাটি দশ হাজারের বেশি, এর মধ্যে আওয়ামি লিগ ৮০৬০, বিএনপি ২০২৪ অন্যান্য ৮৭৯ জন। এখানেও গোজামিল আছে। একাত্তরে পুরো দেশে ছিল আওয়ামি লিগ এবং কিছু পাকিস্তানপন্থী মুসলিম লিগ বা অন্যান্য ইসলামি দল। তখন আওয়ামি লিগাররা রাজাকার হয়নি, মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। তবে দেশের ভিতরে থেকে যাওয়া অনেকে বহুবিধ কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবে 'রাজাকার' বলতে আমরা যা বুঝি, আওয়ামি লিগ কর্মীরা তখন তা হয়নি। বিএনপি-র তখন জন্মই হয়নি, বিএনপি এলো কোত্থেকে? রাজাকাররা মুখ্যত পাকিস্তানপন্থী। এখন হিন্দুদের রাজাকার বানানোর উদ্দেশ্য একটাই, তা হলো বাংলাদেশ একেবারে হিন্দুশূন্য করে দেওয়া। ■

মাস্টারদা সূর্য সেন ও চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

প্রণব দত্ত মজুমদার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের কথা নতমস্তকে স্মরণ করা উচিত। বঙ্গপ্রদেশের বিপ্লবী সংগঠনগুলির মধ্যে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, মাস্টারদা সূর্য সেনের ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি ইত্যাদি বিপ্লবী সংগঠনের কর্মকাণ্ড ইংরেজের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল।

তখনকার অবিভক্ত বাঙ্গলার চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে সূর্য সেনের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম রাজমণি সেন এবং মায়ের নাম শশীবালা দেবী। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে সূর্য সেন চতুর্থ।

ছোটো বয়সেই সূর্য সেন বাবাকে হারিয়েছেন। কাকা গৌরমণি সেনের তত্ত্বাবধানে মানুষ হন তিনি। ছোটোবেলা থেকেই খুব দামাল ছিলেন তিনি; পড়াশুনাতেও ছিলেন খুব ভালো। ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম বিভাগ পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯১৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯১৮ সালে সসম্মানে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ার সময়েই তিনি যুগান্তর দলের নেতা বিপ্লবী সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন এবং গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন।

বিএ পাশ করার পর চট্টগ্রামের উমাতারা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন তিনি এবং অচিরেই ছাত্রদের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। স্কুলে শিক্ষকতার সময় তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রদের নিয়ে সেবাসমিতি গঠন করে সমাজের দীন দুঃখী অসহায় মানুষের জন্য সেবার কাজ করতে থাকেন। সবাই তাকে ভালোবেসে মাস্টারদা বলে সম্বোধন করতেন।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সারা দেশে প্রতিবাদের ঢেউ উঠে। মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করেছিলেন। বিপ্লবী চেতনা তাঁর মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর হতে শুরু করে; তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য চট্টগ্রামে একটি সংগঠিত বিপ্লবী দল গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করেন। ১৯২০ সালে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে সাম্যাশ্রম নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। ক্রমে ক্রমে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় এই সমিতির শাখা গড়ে ওঠে। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলকে এই আন্দোলনে শামিল হতে আহ্বান জানান। মাস্টারদা সূর্য সেন যদিও গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবুও দেশবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২২ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরায় সত্যাগ্রহীদের সামান্য হিংসাত্মক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। প্রচণ্ড হতাশ হয়েছিলেন মাস্টারদা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন গান্ধীজীর অহিংসার পথে ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না।

প্রথম প্রথম সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেও ক্রমে ক্রমে তিনি উপলব্ধি করেন সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া ইংরেজদের তাড়ানো সম্ভব নয়। তিনি তাঁর অনুগামী বিপ্লবীদের নিয়ে তৈরি করেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি এবং চট্টগ্রাম জেলাতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আইরিশ বিপ্লবীদের ধাঁচে চট্টগ্রামের ইংরেজ শাসকের সংস্থাগুলোর উপর ব্যাপক আঘাত হানার পরিকল্পনা করলেন মাস্টারদা এবং তাঁর রিপাব্লিকান আর্মিকে সেইভাবে তৈরি করতে থাকেন।

তাঁর অনুগামী বিপ্লবীদের কাছে তিনি যে কর্মসূচি তুলে ধরলেন তা হলো—চট্টগ্রামের পুলিশ-অস্ত্রাগার ও অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার লুঠ করতে হবে। টেলিফোন টেলিগ্রাম এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করে ইংরেজ প্রশাসকের যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করে দিতে হবে, সরকারি ট্রেজারি লুঠ করে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে হবে, চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে, জেলখানা আক্রমণ করে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করতে হবে, ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে উচ্চপদস্থ ইংরেজদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করতে হবে ইত্যাদি। এইসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার জন্য গোপন পরিকল্পনা আরম্ভ করলেন। বিপ্লবী নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, উপেন বিশ্বাস প্রমুখের উপর এক একটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলেন সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা

সূর্য সেন। মাস্টারদার নেতৃত্বে তাঁরা পরিকল্পনা মাফিক প্রস্তুতি নিতে থাকলেন।

অবশেষে ঠিক হলো ১৮ এপ্রিল (১৯৩০) রাত পৌনে দশটায় অ্যাকশন শুরু হবে। লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ লুঠ করবে তারপর অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে দেবে। একই সময়ে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা পুলিশের অস্ত্রাগার আক্রমণ করে দখল করে নেবে। অম্বিকা চক্রবর্তী ও আনন্দ গুপ্তের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা টেলিগ্রাম ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করে দেবে। ঠিক হলো সবকটি দল একই সময়ে অ্যাকশন আরম্ভ করবে, কাজ শেষ করে বিপ্লবীরা পুলিশ আর্মিতে ফিরে আসবে। সেখানে মাস্টারদা যথাসময়ে আর একটি বাহিনী নিয়ে উপস্থিত থাকবেন এবং সেখানে দলের হেড কোয়ার্টার বসবে।

নিখুঁত পরিকল্পনায়, অমিতবিক্রমে এবং অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিপ্লবীরা তাঁদের কাজ সারলেন। টেলিগ্রাম ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগারের একজন সার্জেন্ট গুলিতে মারা পড়লেন বাকি রক্ষীরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল। অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বন্দুক গুলিগোলা লুঠ করে অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের সহযোগী বিপ্লবীরা ফিরে এলেন পুলিশ আর্মারিতে। পুলিশ আর্মারি ইতিমধ্যে দখল হয়ে গেছে। মাস্টারদা যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে হেড কোয়ার্টার বসালেন। সেখানকার ব্রিটিশের পতাকা, ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয় পুলিশ আর্মারির (অস্ত্রাগারের) মাথায়। তারপর পুলিশ অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। সবাই মিলে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশবাতাস কাঁপিয়ে দিলেন। সবই নিখুঁতভাবে হচ্ছিল কিন্তু অস্ত্রাগারে আগুন লাগাতে গিয়ে বিপ্লবী হিমাংশু সেনের গায়ে আগুন লেগে যায়। গুরুতর ভাবে আহত হিমাংশু সেনকে গাড়িতে তুলে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ। সাহায্য করার জন্য সঙ্গে যান বিপ্লবী জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত। ইতিমধ্যে ইংরেজের পুলিশ খবর পেয়ে গেছে। দূরে একটি ওয়াটার ওয়ার্কস আছে; সেদিক থেকে লুইসগানের গুলির আওয়াজ আসছে। মাস্টারদা উপলব্ধি করলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল, আনন্দ গুপ্তের জন্য আর বেশি অপেক্ষা করলে বিপদ বেড়ে যাবে; তাই তিনি বিপ্লবীদের নিয়ে সুলুকবহর পাহাড়ের দিকে পালালেন। সেখানে তিন দিন অতিবাহিত করেন তাঁরা। কিন্তু সেখানে খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, সংবাদ আদান-প্রদানের কোনো উপায় নেই। তাই ক্ষুধার্ত অবসন্ন বিপ্লবীরা ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

বনে কাঠ কাটতে আসা কাঠুরিয়াদের কাছ থেকে ইংরেজের পুলিশ বিপ্লবীদের খবর পেয়ে যায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিন্স, পুলিশ সুপার মেজর বেকার, অক্সিলিয়ারি ফোর্সের কর্তা ক্যাপ্টেন টেইট, সুরমাভ্যালি বাহিনীর ক্যাপ্টেন রবিন্সসন বিশাল বাহিনী নিয়ে জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেলেন। সারাদিন ধরে তীব্র গুলির লড়াই চলে বিপ্লবীদের সঙ্গে। অবশেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। যুদ্ধ সেদিনকার মতো বন্ধ। ৮০ জন ব্রিটিশ সৈনিক মারা যায় সেই যুদ্ধে। ১২ জন বিপ্লবী শহিদ হলেন। তাঁরা হলেন—বিপ্লবী নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল, মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ ও অর্ধেন্দু দস্তিদার। তাঁদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ব্যথিত চিত্তে অবশিষ্ট বিপ্লবীদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে পাহাড় ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন মাস্টারদা। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ের যেদিকে পুলিশ নেই অনুমান করে সেইদিক দিয়ে পাহাড় ছেড়ে বিভিন্ন দিকে পালালেন।

রিপাব্লিকান আর্মির বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম জুড়ে নানারকম দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে দিল। মাস্টারদা তাঁর অনুগামীদের নিয়ে পলাতক জীবনযাপন করছেন। গোপন আস্তানা থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে মাস্টারদা খবর পেলেন বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল মি. ক্রেক চট্টগ্রাম কুমিল্লা হয়ে চাঁদপুর স্টেশন থেকে কলকাতা যাবেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর উপর দায়িত্ব দিলেন মি ক্রেককে হত্যা করার। ১৯৩০-এর ১ ডিসেম্বর শেষ রাতে যখন মেল ট্রেন চাঁদপুর স্টেশনে ঢোকে তখন খবর অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর কামরায় মি ক্রেককে গুলি করে ওরা। কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় ভুল করেছিলেন বিপ্লবীরা। মারা যান তারিণী মুখার্জি নামে একজন রেলের উচ্চপদস্থ অফিসার। ধরা পরে যান তাঁরা। বিচারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয় আর কালিপদ চক্রবর্তীর দ্বীপান্তর হয়। মাস্টারদার নির্দেশে হরিপদ ভট্টাচার্য নামক একজন চোদ্দ পনেরো বছরের বালক নিজাম পল্টনের মাঠে বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের সময় অত্যাচারী ডি এস পি আসানুল্লা খাঁকে গুলি করে মারে। মাস্টারদার বাহিনীর বিপ্লবীদের গুলিতে মারা যান কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপার অত্যাচারী শাসক মিঃ এলিসন, ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুরনে। চট্টগ্রামের অবস্থা তখন হয়ে উঠেছিল ভয়াবহ। ব্রিটিশ প্রশাসক সান্ধ্য আইন জারি করেছে। ব্রিটিশ পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঘুরে সন্দেহমূলক ছাত্র-যুবকদের তল্লাশির নামে অত্যাচার করছে। বিপ্লবীদের বাড়ি ভাঙচুর করে আত্মীয়স্বজনদের গ্রেপ্তার করছে। যে সকল বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়েছিল তাঁদের অভিযুক্ত করে ব্রিটিশ সরকার শুরু করে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা'। ডিনামাইট ও ল্যান্ডমাইনের সাহায্যে জেলের প্রাচীর উড়িয়ে দিয়ে বন্দি বিপ্লবীদের মুক্তি করার একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু পরিকল্পনাটি প্রকাশ হয়ে পরায় তা ভেস্তে যায়। এককথায় চট্টগ্রামের ব্রিটিশ প্রশাসকের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। পুলিশ ও গয়েন্দারা অবিরাম তল্লাশি চালিয়েও কিছুতেই ধরতে পারছিল না তাঁকে। ব্রিটিশ পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করলো দশ হাজার টাকা। এটা তখনকার দিনে প্রচুর টাকা।

মাস্টারদা তখন চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক যুবক-যুবতীদের প্রেরণা। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস প্রমুখ বীরাঙ্গনা যুবতীরা দলে নাম লিখিয়েছেন।

দিনটা ছিল ১৯৩২ সালের ১৩ জুন। মাস্টারদা চট্টগ্রামের ধলঘাটের সাবিত্রী দেবীর আশ্রমে আত্মগোপন করে আছেন। সঙ্গে আছেন একান্ত বিশ্বস্ত নির্মল সেন, অপূর্ব সেন প্রমুখ। গোপনে দেখা করতে এসেছেন চট্টগ্রামের অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সঙ্গে কল্পনা দত্ত। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে রাতের অন্ধকারেই ফিরে যাবেন তাঁরা। পুলিশ টের পেয়ে গেছিল এই গোপন আস্তানার কথা। ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে ব্রিটিশের পুলিশ ঘিরে ফেলে ওই আস্তানা। প্রচণ্ড গুলির লড়াই চলে। শহিদ হলেন অপূর্ব সেন। প্রচণ্ড আহত হন নির্মল সেন। আহত অবস্থায় তীব্র গুলির লড়াই করে মাস্টারদা, প্রীতিলতা ও কল্পনাকে পালাতে সাহায্য করেন। অবশেষে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

এই ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরও কঠোর হয়ে ওঠেন প্রীতিলতা। ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন একটা অ্যাকশন করার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। মাস্টারদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রীতিলতাকে পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব দিলেন। দিনটা ছিল ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। রাত ১০টা। অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা মিলিটারি পোশাকে সজ্জিত হলেন। সঙ্গে গেলেন মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল দে ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানের বেশে। সবারই পোশাকের অন্তরালে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। পানে-নাচে-গানে মত্ত সাহেব মেমরা। প্রীতিলতা ক্লাবের পিছন দিয়ে সবার নজর এড়িয়ে ঢুকে পরলেন। প্রহরীরা ভাবল ক্লাবের সদস্য কোনো সাহেব অফিসার। মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল দে অন্য কোচম্যানদের সঙ্গে মিশে গেল এবং সকলের নজর এড়িয়ে যথাস্থানে টাইম বোমা সেট করে দিল। প্রীতিলতার ইশারায় তাঁরা বোমা ছুড়ল ক্লাবের মধ্যে। প্রীতিলতা গুলি চালাতে আরম্ভ করলেন। প্রীতির সঙ্গে আসা অন্য বিপ্লবীরা ক্লাবের দুদিক ঘিরে গুলি চালাতে আরম্ভ করল। চারিদিকে হুড়োহুড়ি দৌড়োদৌড়ি আরম্ভ হয়ে গেল। প্রচুর সাহেব মেম হতাহত হলো।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ইংরেজের পুলিশ বাহিনী ছুটে এল। প্রীতিলতা তাঁর সহযোগী বিপ্লবীদের পালাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু নিজে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। তখনকার দিনে একজন শিক্ষিতা তরুণীর এইরকম দুঃসাহসিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সারা দেশের মানুষকে স্তম্ভিত করে গিয়েছিল। যুবক-যুবতীদের মধ্যে আত্মবলিদানের স্পৃহা বেড়ে গেছিলো। তাঁকে দেখে এগিয়ে এসেছিলেন আরও অনেক দুঃসাহসিক বাঙ্গালি তরুণী যেমন—কুন্দপ্রভা, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রক্ষিত, নিরুপমা বড়ুয়া, বকুল দত্ত প্রমুখ। ইংরেজ শাসকের কপালে চিন্তার ভাজ পড়তে লাগল।

মাস্টারদার দলের বিপ্লবীদের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত চট্টগ্রামের ইংরেজ প্রশাসক মাস্টারদাকে ধরার জন্য পাগলের মতো খুঁজতে লাগলো। ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করার পর তিনি গৈরালা গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তখনকার দিনে ১০ হাজার টাকার মূল্য প্রচুর। নেত্র সেন নামক এক ব্যক্তি পুরস্কারের লোভে তার বাড়িতে আশ্রয় দেবার ছল করে ইংরেজ পুলিশকে গোপনে খবর দিয়ে দেয়। এবার আর পালাতে পারলেন না মাস্টারদা। ধরা পড়ে গেলেন তিনি। দিনটা ছিল ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। ইংরেজ প্রশাসক তাঁকে কন্‌ডেম্‌ড সেলের নির্জন প্রকোষ্ঠে রেখে নির্মম ভাবে অত্যাচার করে। তাঁর হাত পা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, নখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল। হাতুড়ি দিয়ে মেরে তাঁর দাঁত ভেঙে ফেলা হয়েছিল। তারপর মৃতপ্রায় শরীরটাকে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি মধ্যরাতে। একই সময়ে মাস্টারদার বিশ্বস্ত আর একজন সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদারকেও ফাঁসি দেয় ইংরেজরা। মাস্টারদাকে ইংরেজরা এতটাই ভয় পেত যে তাঁর মৃতদেহটিকেও ভয় পেয়েছিল তারা। চট্টগ্রামের মাটিতে শেষকৃত্য করতে দেওয়া হয়নি। ইংরেজ শাসক বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিল তাঁর মৃতদেহটিকে।

ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে মাস্টারদা সূর্য সেনের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেছিলেন—'বন্ধুগণ, এগিয়ে চল। কখনো পিছিয়ে যেও না। ...ওঠো, জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।' ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

দোতারা আর সুরমণ্ডলের যুগলবন্দি—'তারামণ্ডল'

তিলক সেনগুপ্ত

ফোক ও ক্ল্যাসিক্যালের মেলবন্ধন ঘটনাতে নতুন তার যন্ত্রের আবিষ্কার!

সত্যিই তাই। লোক সংগীত পরিবেশের জন্য দোতারা এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উপস্থাপনের জন্য সুরমণ্ডলের যুগলবন্দির নয়া সংস্করণ— 'তারামণ্ডল'।

পাতলা কাঠের আবরণের উপর ২০টি তারের বাঁধনেই তারা মণ্ডলের সুরমূর্ছনা।

বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম কালীপুরের বাসিন্দা বাউল শিল্পী নতুন তারযন্ত্র বানিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। ৬৬ বছরের প্রবীণ বাউল শিল্পী নিতাই দাস বাউলের আগে কাঠের বাটি দিয়ে দোতারা, বিশাল আকারের তানপুরা বানিয়েছেন আপন মুনশিয়ানায়। এবার তার নতুন সৃষ্টি তারামণ্ডল।

বাউল জগতে পরিচিত নাম নিতাই দাস বাউল। পূর্ণ দাসের অন্যতম স্নেহধন্য। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাউল সাধনায় ব্রত সিউড়ির কালীপুরের এই খেপা বাউল। নিতান্তই সাধারণ পরিবারের জন্ম তাঁর। বাপ-কাকাদের হাত ধরেই বাউল চর্চায় সঁপেছেন নিজেকে। বাউল একনিষ্ঠ সাধক এই নিতাই দাস বাউল জীবন সায়াহ্নে এসে নতুন করে শিখেছেন খেয়াল। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি অমোঘ টান থেকেই ষাটোর্ধ্বেও তিনি হয়েছেন 'খেয়ালে'র শিক্ষার্থী। আর তা থেকেই তিনি পেয়েছেন নতুন সৃষ্টির নয়া উদ্যম। যার ফল 'তারামণ্ডল'।

ছোট্ট অথচ শক্ত কাঠের পাতলা ফ্রেমের মধ্যে প্লাইউড বসিয়ে যন্ত্রটির কাঠামো করেছেন। যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য হলো একটি যন্ত্রের মধ্যে দোতারা এবং সুরমণ্ডলের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন বাউল সম্রাট পূরণ দাসের স্নেহধন্য এই বাউল শিল্পী। নিতাই দাস নিজে বাউল শিল্পী একই সঙ্গে হিন্দুস্থানি ক্ল্যাসিক্যালের শিল্পী। ফলে ক্ল্যাসিক্যাল গানে তারযন্ত্র হিসেবে সুরমণ্ডল যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনই বাউল শিল্পী হিসেবে দোতারা হাতে বাউল রাজ্যে তার অবাধ বিচরণ। ইতিমধ্যেই জাপন-সহ একাধিক দেশে তাঁর বাউল গান নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন শিল্পী। এদেশের একাধিক রাজ্যে তাঁর নিয়মিত অনুষ্ঠান লেগে আছে। তার মাঝেই যখন গ্রামের বাড়িতে ফেরেন তখন শিল্পী মন খুঁজতে থাকে নতুন কিছু উদ্ভাবনের। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই হাতুড়ি বাটালি হাতে শুরু করেন কাঠ কাটতে। কাঠের কাঠামো তৈরি করে তার সঙ্গে তারের বাঁধনকে দৃঢ় করতে সুরমণ্ডলের জন্য ১৬টি তার। তার মধ্যে এক সপ্তক সুরের জন্য ১২টি তার বেঁধেছে। বাকি চারটি তার দোতারার সঙ্গে যুগলবন্দির জন্য সংযোজিত হয়েছে। আর তার লাগোয়া দোতারার জন্য অতিরিক্ত আরও চারটি তার দোতারার সংযোজনে তৈরি হয়েছে তারামণ্ডল যন্ত্র।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক সম্মানে ভূষিত বাউল শিল্পী নিতাই দাস বাউলের কথায়, ''আমার সাধনার মূল বিষয় খেয়ালের সঙ্গে বাউলের সংমিশ্রণ ঘটনানো। সেই ভাবনা থেকেই দোতারার তারা এবং সুলমণ্ডলের যুগল মিলনেই আমার তৈরি তারযন্ত্র 'তারামণ্ডল'। এই যন্ত্রে এক সঙ্গে শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীত পরিবেশিত হবে। এই যন্ত্র তৈরি আমার সারা বছরের গবেষণার সুফল। আমি আনন্দে মশগুল।''

দেখতে সুরমণ্ডলের মতো। অথচ হাল্কা সহজে অল্প জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবে এই অভিনব যন্ত্র। নিতাই দাস বাউলের গানের তালিম শুরু হয় ছোটো থেকেই। বাবা গতিকান্ত দাসের হাত ধরেই গানের শিক্ষা। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তার মঞ্চে গান করা শুরু। বেতারে নিয়মিত শিল্পী নিতাই দাস বাউল ইতিমধ্যেই বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তার তৈরি যন্ত্র দেখে সমজদার রসিক শিল্পীরা বরাত দিতে শুরু করেছে। এই যুগলবন্দি তারযন্ত্রের। ∎

সংবাদ প্রতিবেদন

শিল্পোৎপাদনে আইআইটির সহযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ চতুর্থ পর্যায়ের শিল্পের জন্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আইআইটি খড়্গপুরের সেন্টার অব এক্সেলেন্স ইন অ্যাডভান্স ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প ও গণ-উদ্যোগ মন্ত্রকের ভারি শিল্প দপ্তর এই লক্ষ্যে একটি তহবিল গড়ে তুলেছে। এই তহবিল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিল্পক্ষেত্রে গবেষণায় শিক্ষানবিশির সুযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করা হবে।

টাটা মোটরস্ টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, টাটা স্টিল, টাটা সন্স, ভেইল, এইচইসি-র মতো শীর্ষ স্থানীয় শিল্প সংস্থাগুলিকে নিয়ে গঠিত একটি কন্সর্টিয়ামে হেমরাজ ইনফোকম প্রথম স্বীকৃত সদস্য। এই কন্সর্টিয়ামটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছে।

আইআইটি খড়্গাপুরের অধ্যাপক সূর্য কে পাল এই সেন্টার অব এক্সলেন্সের প্রধান। তিনি জানান, এই কন্সর্টিয়ামে আরও নতুন নতুন সংস্থা এসে যুক্ত হবে বলে তাঁর আশা। যাদের তারা চতুর্থ পর্যায়ের শিল্পে বিভিন্ন প্রয়োগের বিষয়ে জানাতে পারবেন। হেমরাজ সংস্থাটিকে প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সংস্থার কাছে একটি বার্তা দিতে পারবেন। এই ধরনের সংস্থা এই কেন্দ্র থেকে পরিকাঠামোগত এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পাবে। আইআইটি খড়্গাপুর ওই সংস্থাগুলিকে তাদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য গবেষণালব্ধ নানা পরামর্শ ও অত্যাধুনিক শিল্প প্রযুক্তির বিষয়ে জানাবেন, যার ফলে এই সংস্থাগুলি ক্লাউড কম্প্যুটিং রিয়েল টাইম ডেটা প্রসেসিং-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে ধারণা পাবে।

ভারতের অগ্রগতি সংক্রান্ত সূচক প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে সম্প্রতি সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে ভারতের অগ্রগতি সংক্রান্ত সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি অর্জনে ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে এখনও পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে তা একত্রিত করে এই সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক, ভারতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যালয় এবং গ্লোবাল গ্রিন গ্রোথ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে ভারতে অগ্রগতির সূচক তৈরি করা হয়েছে। সূচক প্রকাশ করে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান ড. রাজীব কুমার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০৩০-এর মধ্যে দেশে সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি অর্জনে প্রচেষ্টায় কোনও ঘাটতি রাখছে না। প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর দৃষ্টি রাখা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। নীতি আয়োগ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দক্ষতা বৃদ্ধি তথা অগ্রগতিতে নজর রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। আগামী ৫ বছরে রাজ্যগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের ফলে সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি পূরণ করার প্রচেষ্টায় গতি আসবে এবং অগ্রগতিও সুনিশ্চিত হবে।

সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণ সংক্রান্ত প্রকাশিত সূচকের দ্বিতীয় সংস্করণে ২০১৮-র তুলনায় সামগ্রিকভাবে ভারতে অগ্রগতি হয়েছে। দেশে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বিশুদ্ধ জল ও স্বাস্থ্য বিধান, শিল্পক্ষেত্র উদ্ভাবন ও পরিকাঠামো-সহ সুলভ ও পরিশ্রুত জ্বালানি ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও অসম উন্নয়নকামী এই তিনটি রাজ্য পারফরমার ক্যাটাগরিতে উঠে এসেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, গোয়া ও সিকিম— এই ৫টি রাজ্য অগ্রগতির সূচকে পারফরমার থেকে ফ্রন্ট রানার ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছে। সূচকে সর্বাধিক ৭০ পয়েন্ট অর্জন করে কেরল প্রথম স্থানে, ৬৯ পয়েন্ট পেয়ে হিমাচলপ্রদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও তামিলনাড়ু ৬৭ পয়েন্ট স্কোর করে একত্রে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

সূচকে অগ্রগতির দিক থেকে সবথেকে ভালো ফলাফল করেছে উত্তরপ্রদেশ। এই রাজ্যটি ২০১৮-র সূচক অনুযায়ী ২৯তম স্থান থেকে ২৩তম স্থানে, ওড়িশা ২৩তম স্থান থেকে ১৫তম স্থানে এবং সিকিম ১৫তম স্থান থেকে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে।

ভারতীয় রেলের যাত্রী ভাড়ার বিন্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় রেল ট্রেন ও স্টেশনে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটি সবসময় বিবেচনা করে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে শেষবারের মতো ভাড়ার পুনর্বিন্যাস করা হয়। সব শ্রেণীর যাত্রীদের ওপর কোনো অতিরিক্ত বোঝা না চাপিয়ে রেলস্টেশন এবং ট্রেনে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুব সামান্য ভাড়া

বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর সঙ্গে সপ্তম পে-কমিশনের প্রস্তাবগুলিও কার্যকর করার কারণে ট্রেনের মাশুলের সরলীকরণের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও, ভারতীয় রেলের দ্রুত আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। রেল তাই সামান্য ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিত্যযাত্রীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে লোকাল ট্রেনের ভাড়া বাড়ানো হয়নি। মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক টিকিটের ভাড়াও অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ ৬৬ শতাংশ যাত্রী এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে প্রভাবিত হবেন না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এমন শ্রেণীর সাধারণ যাত্রীদের ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়বে প্রতি কিলোমিটার পিছু এক পয়সা। পয়লা জানুয়ারি থেকে এই ভাড়া কার্যকর হয়েছে। তবে যাঁরা পয়লা জানুয়ারির আগে টিকিট কেটেছেন, তাঁদের অতিরিক্ত মাশুল গুনতে হবে না। ভাড়া বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ :

(১) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এমন সাধারণ শ্রেণীর ক্ষেত্রে (লোকাল ট্রেন ছাড়া) : কিলোমিটার প্রতি ১ পয়সা করে ভাড়া বৃদ্ধি। (২) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এমন মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রে : কিলোমিটার প্রতি ২ পয়সা করে ভাড়া বৃদ্ধি। (৩) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় : কিলোমিটার প্রতি ৪ পয়সা করে ভাড়া বৃদ্ধি। (৪) লোকাল ট্রেন, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক টিকিটের ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধি হবে না।

রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্ত, বন্দে ভারত, তেজস, হামসফর, মহামনা, গতিমান, অন্ত্যোদয়, গরিব রথ, জনশতাব্দী, রাজ্যরানী, যুব, সুবিধা এবং বিশেষ ভাড়ার বিশেষ ট্রেন, দূরপাল্লার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মেমু ও ডেমু ট্রেনের ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধির হার উপরে উল্লিখিত নিয়মানুসারে হবে। সংরক্ষণ, সুপার ফাস্ট সারচার্জ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাশুল অপরিবর্তিত থাকবে। তবে, এইসব ভাড়ার ক্ষেত্রে যে লেভিগুলি যুক্ত রয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। এইসব লেভিগুলিতে জিএসটি-র পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে।

চোদ্দ জন বিজ্ঞানী স্বর্ণজয়ন্তী ফেলোশিপ পেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় প্রভাব ফেলতে পারে এই রকম উদ্ভাবনী গবেষণার ভাবনাসমৃদ্ধ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ১৪ জন বিজ্ঞানীকে স্বর্ণজয়ন্তী ফেলোশিপে ভূষিত করা হলো। ত্রিস্তরীয় কঠিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিজ্ঞানীদের পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা তাঁদের গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার স্বর্ণজয়ন্তী ফেলোশিপ কর্মসূচি শুরু করে। এই কর্মসূচিতে মেধাবী যুবা বিজ্ঞানীদের বেছে নেওয়া হয়, তাঁদের দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা যাতে তাঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সামনের সারির মৌলিক গবেষণা

চালিয়ে যেতে পারেন। পুরস্কৃত বিজ্ঞানীদের সহায়তা দেয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর। এতে গবেষণার জন্য সব ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়, প্রতি মাসে ফেলোশিপ ভাতা হিসেবে দেওয়া হয় ২৫ হাজার টাকা। এছাড়াও, মাহিনা ব্যতীত পাঁচ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকা গবেষণা সংক্রান্ত অনুদান দেওয়া হয়। ৪৪৩ জন আবেদনকারীর মধ্যে এবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৪ জন বিজ্ঞানীকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

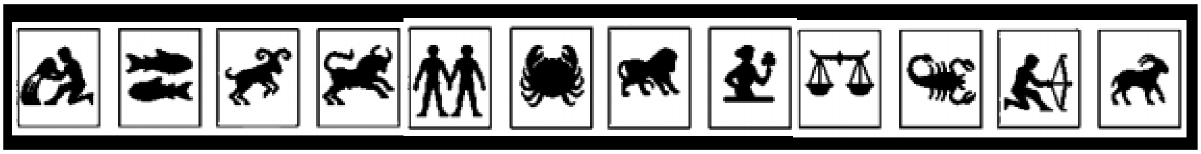

১৩ জানুয়ারি, (সোমবার) থেকে ১৯ জানুয়ারি (রবিবার) ২০২০। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, বৃশ্চিকে মঙ্গল, ধনুতে রবি, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, কেতু, কুম্ভে শুক্র। পুনরায় ১৩-০১- সোমবার, সকাল ১০টা ২ মিনিটে বুধ এবং ১৪-০১-মঙ্গলবার, সকাল ০৬টা ৩২ মিনিটে রবির মকরে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কর্কটে অশ্লেষা নক্ষত্র থেকে তুলায় বিশাখা নক্ষত্রে।

মেষ : পরাক্রান্ত, পরিজনপ্রিয়, পরিব্রাজক, শিল্পরসিক, পরদুঃখকাতর, সৌন্দর্য পিপাসু, বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। রিসার্চস্কলার, প্রযুক্তিবিদ, আইনজ্ঞ, প্রকাশকের প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ, অর্থ, যশ ও প্রতিষ্ঠা। পিতার পরামর্শ বৈষয়িক সমৃদ্ধির সহায়ক। সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি জটিলতার অবসান। পেশাদারদের খ্যাতি, কর্মপ্রার্থীর পার্থিব সুখেরসুলুক সন্ধান। ব্যবসায় বিনিয়োগে বিরত থাকা শ্রেয়।

বৃষ : পারিপার্শ্বিক ও অধস্তনের অসংগতিপূর্ণ ব্যবহারে কর্মক্ষেত্রে চাপ, মনান্তর ও কর্তৃপক্ষের বিরূপতা। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা, নতুন বিনিয়োগে প্রাপ্তি আশাপ্রদ নয়। পারিবারিক শুভ অনুষ্ঠানে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ বৃদ্ধি তবে মায়ের অসুস্থতায় গৃহসুখ বিনষ্ট। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য ও সেবামূলক কর্মে প্রভাবী ব্যক্তির সান্নিধ্যে জীবনের নতুন আঙ্গিকে পথ চলা।

মিথুন : বিদ্যার্থীর উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ। বেকারদের মনঃসংযোগ ও অধ্যাবসায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা। জীবনসঙ্গীর চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন। দুর্জন প্রতিবেশী ও ছলনাময়ীর কূটচালে পারিবারিক অশান্তি। সন্তান-সন্ততির সৃষ্টির আনন্দযজ্ঞে নব নব সংযোজন ও ভবিষ্যতের চিন্তামুক্তি। বেশভূষা ও গৃহসজ্জায় অমিতব্যয়িতার পরিচয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি।

কর্কট : কর্মক্ষেত্রে তৎপরতা ও অভিজ্ঞতায় ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধানে শংসা ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। উত্তেজনা ও ভাবাবেগ পরিহার করে পারিবারিক শান্তির দিকে নজর দিন। পিতৃ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, নবনির্মাণে বিনিয়োগ শুভ ইঙ্গিতবাহী। উচ্চশিক্ষা ও সাহিত্য পিপাসুদের প্রতিভার স্ফুরণ ও স্বীকৃতি, ভ্রাতা-ভগ্নীর উন্নতি ও প্রতিবেশীর সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি। শ্লেষা, হাঁপানিও দন্তপীড়ায় ক্লেশ।

সিংহ : নিকট ভ্রমণ, প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ব্যবসায় সাফল্য, পারিবারিক অসুস্থতায় মানসিক অবসাদ। প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দের অভাব। বয়স্কদের বিরাগভাজন, কৌশলী মনোভাবে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ। কর্মের যোগসূত্রে রমণী সান্নিধ্য। প্রগতিশীল জীবনে সন্তান-সন্ততির দুর্বার গতি।

কন্যা : ব্যুৎপত্তি, পাণ্ডিত্য প্রভাবে খ্যাতি, সাংগঠনিক নিপুণতা, শিশুর সারল্য, দরদি নামে উপাধিস্থ, জীবনসঙ্গীর বিলাসিতায় ব্যয়াধিক্য যোগ। আর্থিক লেনদেন ও শত্রুতা বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। দুরূহ কাজে কঠিন পরিচয়ে সাফল্যের স্বীকৃতি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে নতুন সুহৃদ সম্পর্ক।

তুলা : পেশাদারদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি, নতুন যোগাযোগ, এমনকী কর্ম পরিবর্তনের সম্ভাবনা। প্রমোটিং, ইমারতি দ্রব্য, দালালি, ব্রোকারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগে প্রাপ্তি শুভ। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব, সমাজ সেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগে মানসিক প্রশান্তি। সন্তানের চালচলনে মেজাজি ও জেদভাব, সন্তান সম্ভাবার নেতিবাচক ফল। মান-সম্মানের ক্ষেত্রকে শুভ বলা যায় না।

বৃশ্চিক : পারিবারিক সুস্থিতি ও মাতার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। জীবনসঙ্গীর নামে ব্যবসায় নতুন উদ্যোগের শুভ সময়। দুরূহ কাজের সমাধান ও নতুন কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সফল প্রয়াস। অনুভব ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে আদর্শ গৃহস্বামী। প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সুদক্ষ পরিচালকের আখ্যায় ভূষিত হবেন। বিলাসব্যসন, ভোজন ও বাহনজনিত ব্যয়াধিক্য যোগ।

ধনু : মহানুভবতা, স্বার্থশূন্য, পরম দুঃখকাতরতা, সারল্য, শিষ্ঠাচার, সৌজন্য, প্রফুল্লতায় পরিবার ও সমাজের উজ্জ্বল মুখ ও সাফল্যের অনেক পালক সংযোজিত হবে। জীবনসঙ্গীর উদারতা, কথাবার্তায় আপন করার সপ্রতিভতায় খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। সকল প্রকার লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, দূর গমন পরিতাজ্য। সন্তানের শেষভাগে আর্থিক প্রতিকূলতার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

মকর : পারিবারিক দায়িত্ব পালন ও কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততায় শারীরিক ও মানসিক বিভ্রান্তি। আর্থিক শ্লথ গতিতে ঋণ গ্রহণে ব্যস্ততা। সন্তানের আবেগপ্রবণ মনোভাব ও দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে ধীরস্থির ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। ভগিনীর বিবাহ সংক্রান্ত স্থির সিদ্ধান্ত হবার যোগ। ধার দেওয়া ও বিনিয়োগে নেতিবাচক ফল। মূত্রাশয় ও পতনজনিত আঘাতে ক্লেশ।

কুম্ভ : আলস্য, অবসাদ, মানসিক অস্থিরতায় আসন্ন সিদ্ধি করায়ত্ত হয়েও অধরা থাকার সম্ভাবনা। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, দার্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুশলীদের প্রতিভার ব্যক্তি। আনুষ্ঠানিক ব্যস্ততা, হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে জনহিতে মনোনিবেশ, যশস্বী ও গুণীজন সান্নিধ্য ও ভ্রমণের মনস্কামনা পূরণ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও কূটনীতিজ্ঞদের ব্যস্ততা ও কৌশলে বাজিমাত। অংশীদারি ব্যবসা ও দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি।

মীন : অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য, বিধিবর্হির্ভূত পথে উপার্জনের হাতছানি। মিত্র শত্রুতে পরিণত হওয়া, কাজ ও প্রাপ্তিতে বিলম্ব, একই কাজে একাধিকবার চেষ্টা। গুরুজনের অসুস্থতা, মূল্যবান দ্রব্যাদি হারানো স্মৃতি ও মতিভ্রম। শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়ে অস্থির চিত্ত। সপ্তাহের প্রান্তভাগে নিন্দা মোচন ও জীবনের ঝরাপাতায় নব বসন্তের সমীরণ।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—**শ্রী আচার্য্য**

www.edengroup.in
EDEN
HURRY!!
Limited Period Offer
7Lacs
Onwards
1 RK
1/2 BHK
Meghbalika
Only 1% GST
Between Rajpur & Baruipur, Khasmullick
Adda Zone
Swimming Pool
Landscape Garden
HIRA/P/SOU/2018/000209
https://hira.wb.gov.in/
AC Banquet Hall | AC Gymnasium | Outdoor Kid's Play Area
Toddlers Play Area | Guest Room | Senior Citizen Zone | Rock Climbing | Home Theater
Card Room | Art Walk with Bengal Art & Sculpture
98306 26262

www.edengroup.in
EDEN RICHMOND PARK
READY TO MOVE
NO GST
EDEN
Honest Promises. Honest Performances.
24.50 L Onwards
•2/3 BHK•
Near Narendrapur
(Atlas More, Kodalia)
NEW LAUNCH
EDEN RICHMOND ENCLAVE
14.47 L Onwards
•1/2/3 BHK•
Landscape Garden | AC Community Hall | Swimming Pool | Gymnasium & Spa | Home Theater Room | Children's Play Room | Games Room
Eden Richmond Park: HIRA/P/SOU/2019/000603 • http://hira.web.gov.in
Eden Richmond Enclave: HIRA/P/SOU/2018/000240 • http://hira.web.gov.in
9073666771

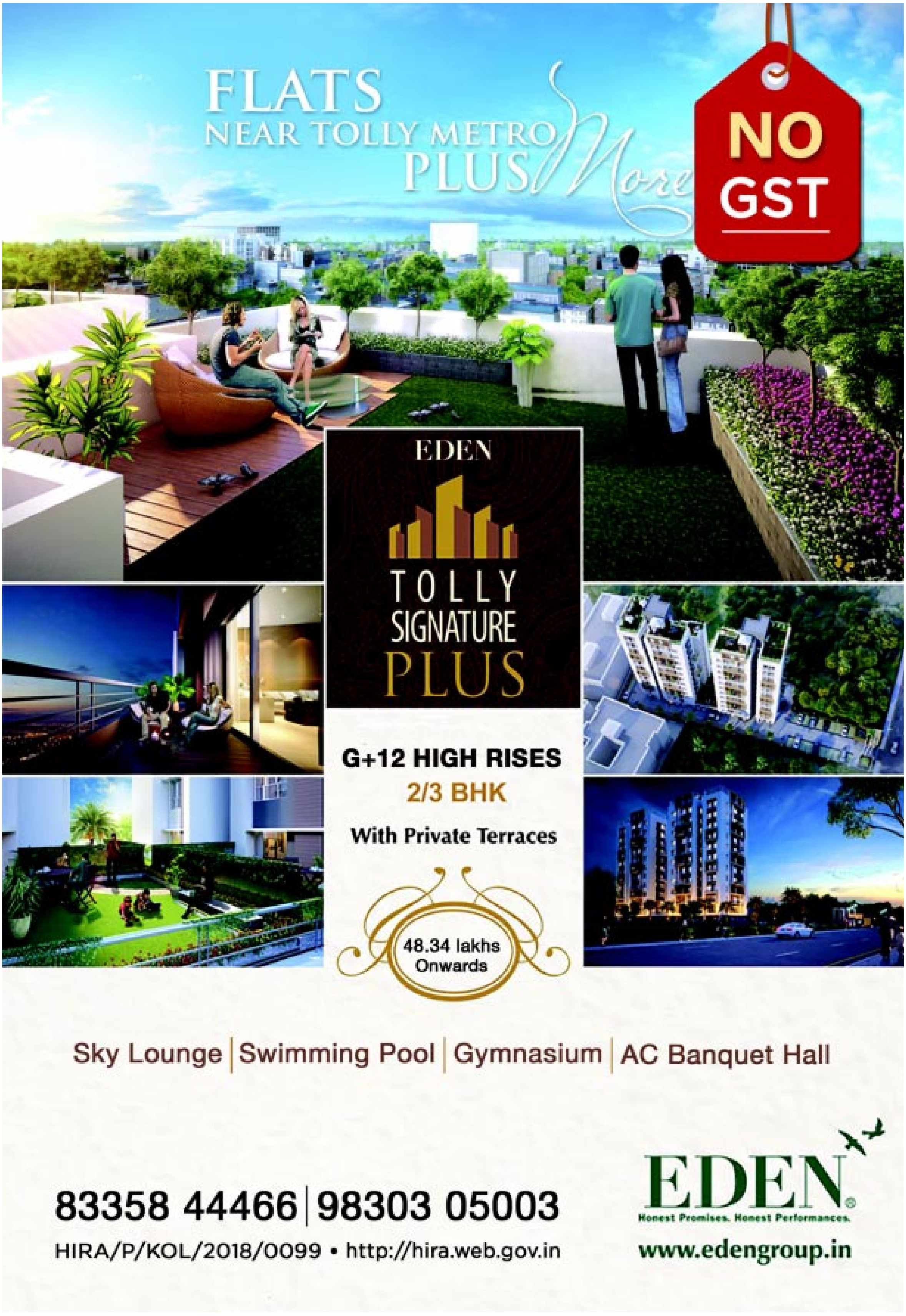
FLATS
NEAR TOLLY METRO
PLUS More
NO
GST
EDEN
TOLLY
SIGNATURE
PLUS
G+12 HIGH RISES
2/3 BHK
With Private Terraces
48.34 lakhs
Onwards
Sky Lounge | Swimming Pool | Gymnasium | AC Banquet Hall
83358 44466 | 98303 05003
HIRA/P/KOL/2018/0099 • http://hira.web.gov.in
EDEN
Honest Promises. Honest Performances.
www.edengroup.in

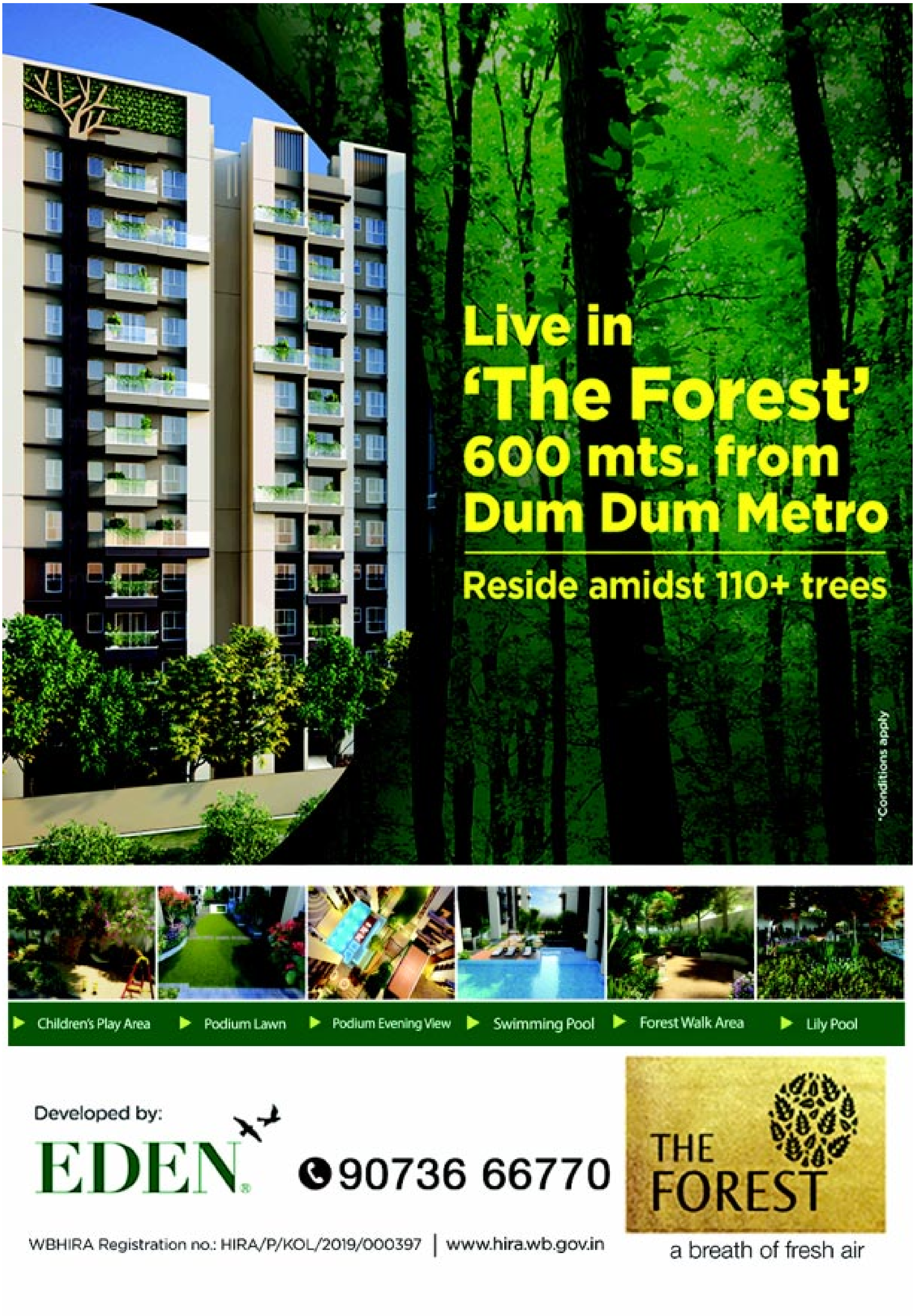

Live in
'The Forest'
600 mts. from
Dum Dum Metro
Reside amidst 110+ trees
*Conditions apply
Children's Play Area
Podium Lawn
Podium Evening View
Swimming Pool
Forest Walk Area
Lily Pool
Developed by:
EDEN
90736 66770
THE FOREST
a breath of fresh air
WBHIRA Registration no.: HIRA/P/KOL/2019/000397 | www.hira.wb.gov.in